বাংলাদেশে
ইক্ষু উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ
একটি হ্যান্ডবুক

ডঃ এবিএম মফিজুর রহমান
ডঃ সমজিৎ কুমার পাল

৩.৬১ ;1
বাং ১

দেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঈশ্বরদী, পাবনা

Neb.

বাংলাদেশে
ইক্ষু উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ
একটি হ্যান্ডবুক

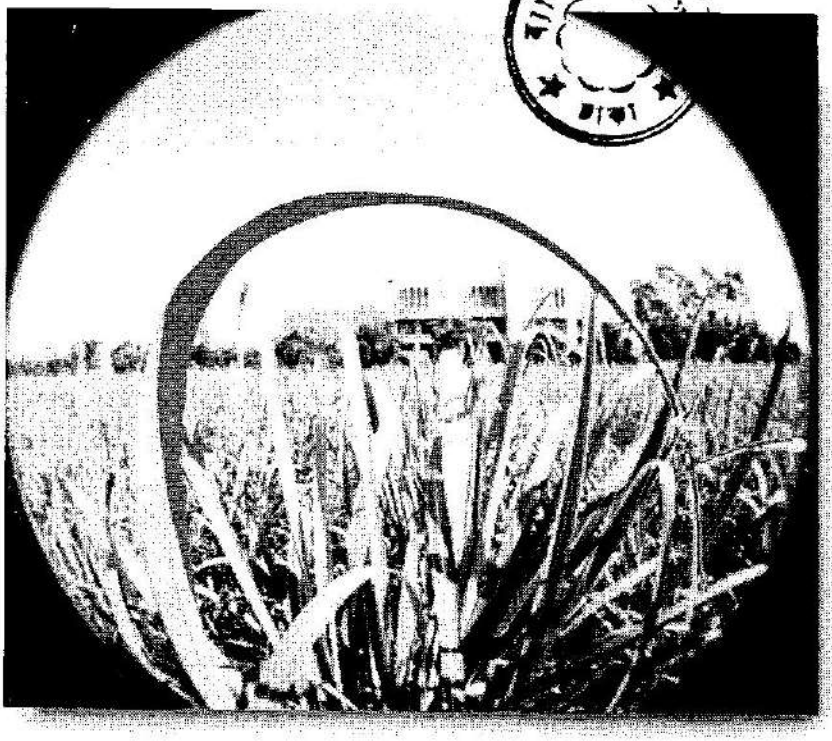

ডঃ এবিএম মফিজুর রহমান
ডঃ সমজিৎ কুমার পাল

বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঈশ্বরদী, পাবনা।

বাংলাদেশে ইক্ষু উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ একটি হ্যান্ডবুক
(Sugarcane Production Technologies in Bangladesh : A Hand Book)

ডঃ এবিএম মফিজুর রহমান
ডঃ সমজিৎ কুমার পাল

প্রকাশনায় ঃ
বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঈশ্বরদী, পাবনা।

প্রকাশনা নং ঃ ৯৯
ISBN : 984-32-1145-5

19452
2.5.06

ডিজাইন ও কম্পোজ ঃ
সাইফ, গ্রাফিক্স সিস্টেম, পাবনা।

মুদ্রণ ঃ
আজাদ রাবার ষ্ট্যাম্প এন্ড প্রিন্টিং প্রেস
শহীদ মার্কেট, রূপকথা রোড, পাবনা।

ডিসেম্বর, ২০০৩ইং

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের কৃষিভিত্তিক শিল্পের মধ্যে চিনিশিল্প উল্লেখযোগ্য যার উপকরণ ও বাজার দুই'ই আমাদের দেশে রয়েছে। তাছাড়া সারাদেশেই গুড় উৎপন্ন হয়। এ দু'টি শিল্পেরই কাঁচামাল ইক্ষু। তবে বর্তমানে দেশে যে পরিমাণ ইক্ষু উৎপাদন হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট অপ্রতুল। সেজন্য দরকার উন্নত ইক্ষুজাত ও চাষ প্রযুক্তির দ্রুত সম্প্রসারণ। বাংলাদেশে এ কাজটি করে থাকেন মূলত দু'টি সংস্থা ঃ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা এবং বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। চিনিকল এলাকায় ইক্ষু সম্প্রসারণে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা কিছুটা অগ্রগামী হলেও চিনিকল বহির্ভূত গুড় উৎপাদন এলাকায় ইক্ষু সম্প্রসারণে তেমন কোন সাফল্য অর্জিত হয়নি। চিনিকল এলাকার প্রায় শতকরা ৯৯ ভাগ জমিতে বিএসআরআই উদ্ভাবিত ইক্ষুজাত আবাদ হয় আর গুড় এলাকায় তা হয় মাত্র শতকরা ৫৫ ভাগ জমিতে। তাছাড়া চিনিকল বহির্ভূত এলাকায় ইক্ষু সম্প্রসারণ কর্মকান্ডও ততটা জোরালো নয়। মূলতঃ এসব কারণেই চিনিকল এলাকায় ইক্ষুর গড় ফলন ৪৬ টন/হেক্টর আর গুড় এলাকায় ইক্ষুর গড় ফলন ৩৬ টন/হেক্টর।

চিনি ও গুড়ে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে এ অবস্থার উন্নতিসাধন অপরিহার্য। বিএসআরআই উদ্ভাবিত সকল প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে ইক্ষুর ফলন বৃদ্ধি করার জন্য কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ ও প্রশিক্ষিত করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন ইক্ষুচাষ বিষয়ক বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা উপকরণ। এরকম একটি মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই রচিত হয়েছে **"বাংলাদেশে ইক্ষু উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ একটি হ্যান্ডবুক"** শীর্ষক এ বইটি। এ বইটিতে ব্যবহৃত হয়েছে প্রচুর ছবি এবং সহজ সরল ভাষা। ফলে এটি গ্রামাঞ্চলের অল্পশিক্ষিত ইক্ষুচাষীদের এবং ইক্ষু প্রযুক্তি সম্প্রসারণে কর্মরত সকল মাঠকর্মীদের জন্য যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বইটির রচয়িতাগণের এ মহৎ উদ্দ্যোগ তাই প্রশংসার দাবী রাখে।

এ বইটি থেকে উপকৃত হয়ে ইক্ষুচাষীগণের ভাগ্যোন্নয়নের পাশাপাশি দেশ চিনি ও গুড় শিল্পে বিকশিত হোক এ কামনা করছি। আমি বইটির ব্যাপক প্রচার কামনা করি।

ডঃ এম. নূরুল আলম
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
১.	ভূমিকা	৫
২.	উন্নত ইক্ষুজাত নির্বাচন	৮
৩.	উন্নত ইক্ষুজাতসমূহের সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য	১০
৪.	বিএসআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত ইক্ষুজাতের অবমুক্তির সন, ফলন, চিনি আহরণ হার ও পরিপক্কতার ধরণ	১৫
৫.	জমি নির্বাচন ও জমি প্রস্তুতি	১৬
৬.	প্রচলিত ইক্ষুচাষ পদ্ধতি	২২
৭.	ইক্ষুচাষের উন্নত পদ্ধতি	২৪
৮.	রোপা ও প্রচলিত পদ্ধতির তুলনামূলক বিবরণ	২৫
৯.	সার প্রয়োগ	২৯
১০.	বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের জন্য সুপারিশকৃত সারের মাত্রা	৩৪
১১.	সাথীফসল চাষ	৩৫
১২.	ইক্ষুর ক্ষতিকর পোকা দমন ব্যবস্থাপনা	৩৮
১৩.	ইক্ষুর রোগবালাই ও তার প্রতিকার	৪৯
১৪.	ইক্ষুর আন্ত পরিচর্যা, ইক্ষু কাটা ও মুড়ি চাষ	৫৪
১৫.	ইক্ষু খামার যান্ত্রিকীকরণ	৫৮
১৬.	গুড় উৎপাদন	৬১
□	উন্নত পদ্ধতিতে ইক্ষুচাষ বিষয়ক ধারাবাহিক চিত্রাবলী	৬৪
১.	আখের জাত সনাক্তকরণের সহায়ক অঙ্গসংস্থানসমূহ	৬৪
২.	উন্নত ইক্ষুজাতসমূহ ও তাদের সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য	৬৫
৩.	উন্নত পদ্ধতিতে ইক্ষুচাষ	৮৫
৪.	ইক্ষুর সাথে বিভিন্ন প্রকার সাথীফসলের চাষ	৮৯
৫.	ইক্ষুর রোগবালাই ও তার দমন ব্যবস্থাপনা	৯৩
৬.	ইক্ষুর পোকা মাকড় ও তার দমন ব্যবস্থাপনা	৯৫
৭.	ইক্ষুর পুষ্টি চাহিদা ও ইক্ষুর জমিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার সার	১০১
৮.	ইক্ষু খামার যন্ত্রায়ন	১০৩
৯.	বিএসআরআই উদ্ভাবিত কয়েকটি খামার যন্ত্র	১০৪
১০.	উন্নত ইক্ষুজাত ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণ	১০৬
১১.	গুড় উৎপাদন	১০৮
১২.	খেজুর, তাল ও গোলপাতা গাছ থেকে রস আহরণ ও গুড় তৈরী	১১১

ভূমিকা

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি ভিত্তিক শিল্প ফসলের গুরুত্ব এদেশে অপরিসীম। ইক্ষুর উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এদেশের চিনি ও গুড় শিল্প যা উত্তরাঞ্চলের একমাত্র ভারী শিল্প। তাই উত্তরাঞ্চলের তথা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতিতে ইক্ষুর অবদান সবচেয়ে বেশি। চিনিকল এলাকায় প্রায় ৬ লক্ষ চাষী পরিবার সরাসরি ইক্ষু চাষের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া চিনিকল বহির্ভূত গুড় উৎপাদন এলাকায় এবং চিবিয়ে খাওয়া ইক্ষু উৎপাদনের জন্য সারাদেশে প্রায় ২০.০ লক্ষ চাষী পরিবার ইক্ষু ফসলের উপর নির্ভরশীল। চিনিকলগুলো প্রতিবছর ইক্ষুচাষীদের মধ্যে প্রায় ৫০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করে, ২৫০-৩০০ কোটি টাকার ইক্ষু ক্রয় করে, তাছাড়া নিজ নিজ এলাকার সড়ক, জনপথ, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিদ্যুতায়ন, হাট-বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গড়ে ওঠায় চিনিকলগুলোই গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। প্রায় ২৫ হাজার পরিবারের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হচ্ছে চিনিশিল্পে। তাছাড়া ইক্ষু কাটা, পরিবহন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজে কর্মসংস্থান হচ্ছে বিপুল সংখ্যক মানুষের।

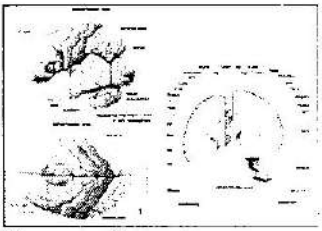

মস্তিষ্কের উপযুক্ত বিকাশ ও পূর্ণ কার্যকারিতার জন্য চিনি একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। প্রতি ১০০ গ্রাম ব্রেনের জন্য প্রতি মিনিটে গ্লুকোজ (চিনির সরল উপাদান) দরকার ৫.৫ মি.গ্রা., অক্সিজেন দরকার ৩.৫ মি.লি.এবং গ্লুটামেট দরকার হয় ০.৪ মি.গ্রা.। এ হিসেবে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষের ব্রেনের উপযুক্ত কার্যকারিতার জন্য প্রতি মিনিটে গ্লুকোজ (চিনির সরল উপাদান) দরকার ৭৭ মি.গ্রা., অক্সিজেন দরকার ৪৯ মি.লি.এবং গ্লুটামেট দরকার হয় ৫.৬ মি.গ্রা.। পক্ষান্তরে প্রতি ১০০ গ্রাম ব্রেন থেকে প্রতি মিনিটে উৎপাদিত হয় ৩.৫ মি.লি. কার্বন-ডাই অক্সাইড ও ০.৬ মি.গ্রা. গ্লুটামিন।

সারণী ১ঃ একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষের মস্তিষ্কের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও উৎপাদিত দ্রব্য

উপকরণ	প্রতি মিনিটে প্রতি ১০০ গ্রাম মস্তিষ্কের গ্রহণ (±) কিংবা উৎপাদনের পরিমাণ (-)	মোট/মিনিট
ব্যবহৃত উপকরণ		
অক্সিজেন গ্লুকোজ গ্লুটামেট	± ৩.৫ মি.লি. + ৫.৫ মি.গ্রা. + ০.৪ মি.গ্রা.	± ৪৯ মি.লি. + ৭৭ মি.গ্রা. + ৫.৬ মি.গ্রা.
উৎপাদিত দ্রব্য		
কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্লুটামিন	- ৩.৫ মি.লি. - ০.৬ মি.গ্রা.	
যেসব দ্রব্য গৃহীত/উৎপন্ন হয় না ঃ ল্যাকটেট, পাইরুভেট, সকল কীটোন, ও আলফা-কীটোগ্লুটামেট		

Modified from Sokoloff, L. 1960. Metabolism of the central nervous system in vivo. In. Hand book of Physiology. Section 1. Vol. III. Page 1843. American Physiology Society.

পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে খাদ্যের শতকরা ১১ ভাগ ক্যালরী চিনি বা গুড় থেকে আসা উচিত। সেকারণেই বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (FAO) মাথাপিছু বছরে কমপক্ষে ১৩ কেজি চিনি গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরের (১৯৯৬) হিসেব অনুযায়ী দেশে মাথাপিছু চিনি ও গুড় গ্রহণের পরিমাণ যথাক্রমে ২.৬ কেজি ও ৪.১ কেজি। সে অনুযায়ী দেশে মোট গুড় ভোগের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫ লক্ষ টন। অন্যদিকে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের রিপোর্টে (১৯৯৬) দেশে মাথাপিছু চিনি ও গুড় গ্রহণের পরিমাণ যথাক্রমে ৩.০ কেজি ও ৩.৬৬ কেজি। প্রতিবছরই দেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ (প্রায় ২.০ লক্ষ টন) চিনি বিদেশ থেকে অননুমোদিত উপায়ে আসে। ফলে বাংলাদেশে গড়ে প্রতিবছর প্রায় ৯.০০ লক্ষ টন (নিজস্ব উৎপাদন ২.০ লক্ষ টন+আমদানী ৪-৫ লক্ষ টন+অননুমোদিত পন্থায় আসা ২.০ লক্ষ টন) চিনি ভোগ করা হয় এবং এতে মাথাপিছু চিনি গ্রহণের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৬.০০ কেজি। তবে বিশ্ব খাদ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী দেশে চিনি গ্রহণের পরিমাণ নিম্নরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

	সাল		
	২০০০	২০০৫	২০১০
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	১৩১.৮৫	১৪৪.৮০	১৫৩.৪৪
চিনির চাহিদা (লক্ষ টন)	১৭.১৪	১৮.৮২	১৯.১৫

বর্তমান ভোগের ভিত্তিতে দেশে কমপক্ষে ০.৩ মিলিয়ন টন চিনি ও ০.৬ মিলিয়ন টন গুড় উৎপাদন করা প্রয়োজন। আর এ পরিমাণ চিনি ও গুড় উৎপাদনের জন্য দরকার ১১.১০ মিলিয়ন টন আখের নিশ্চিত সরবরাহ (চিনি আহরণের হার ৮.১% এবং গুড় আহরণের হার ৯.১%)। দেশে প্রতিবছর গড়ে ০.১৮০ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে আখ চাষ হয়; এর মধ্যে ০.১০০ মিলিয়ন হেক্টর চিনিকল এলাকায় এবং ০.০৮০ মিলিয়ন হেক্টর চিনিকল বহির্ভূত গুড় উৎপাদন এলাকায়। প্রতিবছর প্রায় ৭.৩২ মিলিয়ন টন আখ উৎপাদিত হয় এবং এর গড় ফলন দাঁড়ায় ৪০.৫২ টন/হেক্টর (চিনিকল এলাকায় ৪৬ টন/হেক্টর, গুড় এলাকায় ৩৬ টন/হেক্টর) (বিবিএস ১৯৯৫, এ্যানোনিমাস ১৯৯৬)। বিএসআরআই উদ্ভাবিত উন্নত জাত ও প্রযুক্তি প্রয়োগ করে আখের এই নিম্ন ফলনকে অতি সহজেই হেক্টর প্রতি ৭০ টন-এ উন্নীত করা সম্ভব। তাছাড়া বর্তমানে কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে দেশে খাদ্য শস্যের চাহিদা পূরণের জন্য শুধুমাত্র ইক্ষুর একক আবাদ যুক্তিযুক্ত নয়। আবাদযোগ্য জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য ও সার্বিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচলিত ফসল বিন্যাসের সাথে ইক্ষু ও সাথীফসলের আবাদ সমন্বয় করা প্রয়োজন।

গুড় এদেশের একটি গ্রামীণ শিল্প। বিভিন্ন ধরণের খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন থাকার কারণে গুড় চিনির চেয়ে পুষ্টিমানে শ্রেয়। কিন্তু স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরী না হওয়ার কারণেই গুড়কে আরো বেশি জনপ্রিয় করে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। দেশের উপকূলীয় এলাকার ২০ লক্ষ হেক্টর জমির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এবং চর এলাকার প্রায় ১ লক্ষ হেক্টর জমি গুড় উৎপাদনের লক্ষ্যে ইক্ষু চাষের আওতায় আনা যায়। এভাবেই গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি প্রয়োগ করে একক জমিতে অধিক ইক্ষু উৎপাদনপূর্বক চিনি ও গুড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশকে চিনি ও গুড়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা সম্ভব। সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই সারাদেশের ইক্ষুচাষীদেরকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইক্ষুচাষ সম্পর্কে অতি সহজে ধারণা দেয়ার জন্যই এ বইটি প্রকাশিত হলো।

এ বইটির রচনায় অনেকেই যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। এর মধ্যে ডঃ মোঃ আব্দুল মান্নান, ডঃ এম এ সামাদ মিয়া, জনাব মোঃ ওসমান গণী, ডঃ মোঃ আরিফুল আলম, জনাব মদন মোহন বিশ্বাস, জনাব বিষ্ণুপদ পোদ্দার, ডঃ মোঃ সলিমুল্লাহ খান ইউসুফজাই, ডঃ মোঃ ইব্রাহিম তালুকদার, ডঃ মু. খলিলুর রহমান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ তাদের নিজ নিজ বিষয়ের তথ্যাবলী সরবরাহ করে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। জনাব মোঃ নিজামউদ্দিন খান বইটির জন্য প্রয়োজনীয় ছবি ও অঙ্গসজ্জার কাজটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছেন। বইটি পাঠকমহলে সমাদৃত হবে এবং এ বই থেকে দেশের ইক্ষুচাষীগণ উপকৃত হবেন বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

উন্নত ইক্ষুজাত নির্বাচন

(উন্নত ইক্ষুজাত বিষয়ক চিত্রাবলী পৃষ্ঠা ৬৪-৮৪ দ্রষ্টব্য)

সফলভাবে ইক্ষুচাষের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন একটি উন্নত ইক্ষুজাত নির্বাচন। ভাল জাত ছাড়া কখনোই ভাল ফসল উৎপাদন সম্ভব নয়। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এ পর্যন্ত ৩৫টি উন্নত ইক্ষুর জাত অবমুক্ত করেছে। এরমধ্যে ১৩টি জাত চিনিকল এলাকাসমূহের প্রায় ৯৯% আখের জমিতে আবাদ হচ্ছে। অন্যদিকে গুড় উৎপাদন এলাকার প্রায় ৬০% জমিতে উক্ত জাতসমূহ বিস্তার লাভ করেছে।

চিনিকল এলাকায় নতুন ইক্ষুজাত চাষাবাদে আগ্রহী ইক্ষুচাষীগণকে স্থানীয় চিনিকলের ইক্ষু বিভাগের সঙ্গে অথবা বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটে যোগাযোগ করতে হবে। চিনিকল বর্হিভূত গুড় উৎপাদন এলাকায় যারা নতুন ইক্ষুজাত চাষাবাদে আগ্রহী তাদেরকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর অথবা বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটের নিকটস্থ অফিসে যোগাযোগ করতে হবে।

নতুন উদ্ভাবিত সকল ইক্ষুজাতই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে অনন্য। সে কারণেই একজন ইক্ষুচাষীকে তার প্রয়োজন কিংবা সীমাবদ্ধতার উপর ভিত্তি করে তার নিজস্ব জমির জন্য উপযোগী ইক্ষুজাতটি বাছাই করতে হয়। এখানে উন্নত ইক্ষুজাতসমূহের বৈশিষ্ট্যাবলী উল্লেখ করা হলো।

- **খরা, বন্যা, জলাবদ্ধতা ও লবনাক্ততাসহ প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু ইক্ষুজাতসমূহ ঃ**

  ঈশ্বরদী ২০, ঈশ্বরদী ২১, ঈশ্বরদী ২২, ঈশ্বরদী ২৪, ঈশ্বরদী ২৫, ঈশ্বরদী ২৬, ঈশ্বরদী ২৭, ঈশ্বরদী ২৮, ঈশ্বরদী ২৯, ঈশ্বরদী ৩০, ঈশ্বরদী ৩১, ঈশ্বরদী ৩২, ঈশ্বরদী ৩৩, ঈশ্বরদী ৩৪, ঈশ্বরদী ৩৫ ও ঈশ্বরদী ৩৬ জাতসমূহ।

- **আগাম পরিপক্ক ইক্ষুজাতসমূহ ঃ**

  ঈশ্বরদী ১৬, ঈশ্বরদী ২৪, ঈশ্বরদী ২৬, ঈশ্বরদী ২৭, ঈশ্বরদী ৩৩, ঈশ্বরদী ৩৫ ও ঈশ্বরদী ৩৬।

- **মধ্যম পরিপক্ক ইক্ষুজাতসমূহ ঃ**

  ঈশ্বরদী ১৯, ঈশ্বরদী ২০, ঈশ্বরদী ২৮, ঈশ্বরদী ৩২ ও ঈশ্বরদী ৩৪।

- **নাবি পরিপক্ক ইক্ষুজাতসমূহ ঃ**

  ঈশ্বরদী ১৫ (বিএস ৯৬)

- **গুড় উৎপাদন উপযোগী ইক্ষুজাতসমূহ ঃ**

  ঈশ্বরদী ১৬, ঈশ্বরদী ২১, ঈশ্বরদী ২২, ঈশ্বরদী ২৪, ঈশ্বরদী ২৬, ঈশ্বরদী ২৯, ঈশ্বরদী ৩০, ঈশ্বরদী ৩১, ঈশ্বরদী ৩২, ঈশ্বরদী ৩৩, ঈশ্বরদী ৩৪, ঈশ্বরদী ৩৫ ও ঈশ্বরদী ৩৬ জাতসমূহ।

- **মুড়ি আখ চাষ উপযোগী ইক্ষুজাতসমূহ ঃ**

  ঈশ্বরদী ২/৫৪, এলজেসি, ঈশ্বরদী ১৮, ঈশ্বরদী ২০, ঈশ্বরদী ২১, ঈশ্বরদী ২৭, ঈশ্বরদী ২৮, ঈশ্বরদী ২৯, ঈশ্বরদী ৩০, ঈশ্বরদী ৩১, ঈশ্বরদী ৩২, ঈশ্বরদী ৩৩ ও ঈশ্বরদী ৩৪ জাতসমূহ।

- **চিবিয়ে খাওয়ার উপযোগী ইক্ষুজাতসমূহ ঃ**

  সিও ২০৮, সিও ৫২৭, গ্যান্ডারী, কাজলা, অমৃত এবং ঈশ্বরদী ২৪।

উন্নত ইক্ষুজাতসমূহের সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য

(উন্নত ইক্ষুজাতসমূহের ছবি পৃষ্ঠা ৬৪-৮৪ তে দ্রষ্টব্য)

ঈশ্বরদী ২/৫৪ ঃ

মাড়াই মৌসুমের মাঝামাঝি পরিপক্ক এ জাতটি ১৯৬৭ সাল থেকে চাষাবাদ হচ্ছে। উঁচু হতে মাঝারী উঁচু জমিতে চাষযোগ্য এ জাতের গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ৭৯ টন। বর্তমানে সর্বোচ্চ চিনি আহরণের হার ১০.৪০%। এই জাতটি বন্যা ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু এবং গুড় তৈরীর জন্য মধ্যম হিসাবে বিবেচিত। এটি একটি অপুষ্পক জাত। বৃহত্তর পাবনা, জয়পুরহাট, জামালপুর, রাজশাহী ও চুয়াডাংগা এলাকার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী হলেও জাতটি সারাদেশে চাষযোগ্য।

ঈশ্বরদী ১৬ ঃ

শক্ত, মোটা, আগাম পরিপক্ক জাতটি ১৯৮১ সালে অবমুক্ত করা হয়েছে। উঁচু হতে মাঝারী উঁচু জমিতে চাষযোগ্য এ জাতের গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ৯২ টন। সর্বোচ্চ চিনি আহরণের হার ১২.২৮% এবং গুড় তৈরীর জন্য খুবই ভাল। এটি একটি সপুষ্পক জাত। ঈশ্বরদী ১৬ বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া জেলার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।

এল জে সি ঃ

মধ্যম মোটা, শক্ত ও মধ্যম পরিপক্ক জাতটি ১৯৮২ সনে অবমুক্ত করা হয়েছে। উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমিতে চাষ ভাল হয়। গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ৭৯ টন। সর্বোচ্চ চিনি আহরণের হার ১০.৭৫%। এ জাতের আখ হতে ভাল মানের গুড় তৈরী করা যায়। এ জাতে ফুল হয় না। এটি বন্যা ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু। এ জাতটি সারাদেশে চাষযোগ্য তবে বৃহত্তর যশোহর, ময়মনসিংহ ও কুষ্টিয়ায় বিশেষভাবে উপযোগী।

ঈশ্বরদী ১৯ ঃ

মাঝারী মোটা এবং মধ্যম পরিপক্ক এ জাতটি ১৯৮৮ সালে অবমুক্ত করা হয়। এটি উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমিতে চাষযোগ্য। গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ৮৩ টন। সর্বোচ্চ চিনি আহরণের হার ১১.০৬%। গুড়ের মান মধ্যম। এটি একটি সপুষ্পক জাত। ঈশ্বরদী ১৯ বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা, জামালপুর ও জয়পুরহাট জেলার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।

ঈশ্বরদী ২০ ঃ

অধিক অঙ্কুরোদগম ও কুশী উৎপাদন মতাসম্পন্ন মধ্যম পরিপক্ক এ জাতটি ১৯৯০ সালে অবমুক্ত করা হয়েছে। উঁচু ও মাঝারী উঁচু এবং নীচু জমিতে চাষযোগ্য। গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ৭২ টন সর্বোচ্চ চিনি আহরণের হার ১১.০২%। এটি খরা, বন্যা ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু এবং নাবী চাষ করলেও ফলন ভাল হয়। মুড়ি আখের জন্য উপযুক্ত।

গুড়ের মান মধ্যম। এ জাতের আখে কদাচিৎ ফুল হয়। দেশের সকল এলাকায় চাষ করা যায় তবে রাজশাহী, পাবনা ও জয়পুরহাট এলাকার জন্য বিশেষ উপযোগী।

ঈশ্বরদী ২১ ঃ

আগাম পরিপক্ক, মধ্যম মোটা ও খাড়া এজাতটি ১৯৯০ সালে অবমুক্ত করা হয়েছে। উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমিতে চাষযোগ্য এবং জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু । গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ৭১ টন এবং সর্বোচ্চ চিনি আহরণের হার ১২.১০%। গুড়ের মান বেশ ভাল। এ জাতের আখে ফুল হয়। বৃহত্তর পাবনা, জামালপুর, জয়পুরহাট ও রাজশাহী জেলার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।

ঈশ্বরদী ২২ ঃ

আগাম পরিপক্ক, দ্রুত বর্ধনশীল, মুড়ি উৎপাদনক্ষম জাতটি ১৯৯৩ সালে অবমুক্ত করা হয়েছে। উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমিতে এবং চর এলাকার জন্য বিশেষ উপযোগী গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ৬৫ টন, সর্বোচ্চ চিনি আহরণের হার ১১.৩৪%। বন্যা, জলাবদ্ধতা ও খরা সহিষ্ণু এ জাতটির গুড়ের মান বেশ ভাল। এ জাতের আখে দেরীতে ফুল হয়। বৃহত্তর রাজশাহী, জয়পুরহাট, পাবনা, চুয়াডাংগা ও জামালপুর জেলার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।

ঈশ্বরদী ২৪ ঃ

আগাম পরিপক্ক ও মধ্যম মোটা এ জাতটি ১৯৯৩ সালে অবমুক্ত করা হয়েছে। উঁচু, মাঝারী উঁচু এবং নীচু সব রকম জমিতে চাষযোগ্য। গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ৪৯ টন। সর্বোচ্চ চিনি আহরণের হার ১০.৯৮%। এ জাতটি খরা, বন্যা ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু। এ জাত থেকে উন্নত মানের গুড় উৎপাদন করা যায়। । এটি একটি সপুষ্পক জাত। এছাড়া, চিবিয়ে খাওয়ার জন্যও জাতটি বেশ উপযোগী। আবাদের জন্য বৃহত্তর পাবনা, রাজশাহী ও জয়পুরহাট এলাকা বিশেষভাবে উপযোগী।

ঈশ্বরদী ২৫ ঃ

এটি একটি মধ্যম পরিপক্ক ও খাড়া জাত। এ জাতটি ১৯৯৩ সালে অবমুক্ত করা হয়। উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমিতে এবং নদীর চর ও বন্যাপ্রবন এলাকায় চাষযোগ্য। গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ৬২ টন। সর্বোচ্চ চিনি আহরণের হার ১০.৫৬%। বন্যার পানি সহ্য করতে পারে। গুড়ের মান মধ্যম। এ জাতের আখে ফুল হয়। জাতটি বৃহত্তর রাজশাহী, জয়পুরহাট, রংপুর, দিনাজপুর ও পাবনা জেলার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী তবে সারা দেশেই চাষ করা যায়।

ঈশ্বরদী ২৬ ঃ

আগাম পরিপক্ক ও অধিক মাড়াইযোগ্য আখ উৎপাদনকারী এ জাতটি ১৯৯৫ সালে অবমুক্ত করা হয়। উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমিতে চাষযোগ্য। গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ৬০ টন এবং চিনি আহরণের হার ১১.৮০%। পাতা দীর্ঘ দিন সবুজ থাকে তাই ফেব্রুয়ারী-মার্চ পর্যন্ত মাঠে রাখা যায়। জাতটি কিছুটা খরা সহিষ্ণু এবং গুড়ের মান খুবই ভাল। এ জাতের আখে কদাচিৎ ফুল হয়। জাতটি বৃহত্তর রাজশাহী, চুয়াডাংগা, জয়পুরহাট, দিনাজপুর ও পাবনা এলাকার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।

ঈশ্বরদী ২৭ ঃ

আগাম পরিপক্ক ও অধিক মুড়িআখ উৎপাদনক্ষম এ জাতটি ১৯৯৫ সালে অবমুক্ত করা হয়। এ জাতটি উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমিতে চাষযোগ্য। গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ৭০ টন। মধ্যম মানের খরা ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু। গুড়ের মান ভাল. সর্বোচ্চ চিনি আহরণের হার ১২.৪০%। এটি একটি সপুষ্পক ইক্ষুজাত। জাতটি বৃহত্তর রাজশাহী, চুয়াডাংগা, দিনাজপুর, রংপুর, জামালপুর, জয়পুরহাট ও পাবনা জেলার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।

ঈশ্বরদী ২৮ ঃ

লম্বা কান্ড বিশিষ্ট, মাঝারী শক্ত ও মধ্যম পরিপক্ক এ জাতটি ১৯৯৬ সালে অবমুক্ত করা হয়। এ জাতটি উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমিতে চাষযোগ্য. গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ৭৮ টন। সর্বোচ্চ চিনি আহরণের হার ১১.৩০%। এ জাতটি জলাবদ্ধতা, খরা ও বন্যা ভালভাবে সহ্য করতে পারে। গুড়ের গুণগত মান খুবই ভাল। এ জাতে ফুল হয়। বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর, জামালপুর, জয়পুরহাট, রাজশাহী, পাবনা ও চুয়াডাংগা এলাকার জন্য ঈশ্বরদী ২৮ বিশেষভাবে উপযোগী।

ঈশ্বরদী ২৯ ঃ

এটি একটি মধ্যম পরিপক্ক জাত। অধিক ফলনযুক্ত এ জাতটি ১৯৯৮ সালে অবমুক্ত করা হয়। উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমিতে চাষযোগ্য। গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ৭১ টন। সর্বোচ্চ চিনি আহরণের হার ১০.৭৫%। গুড়ের মান ভাল। জাতটি খরা ও জলাবদ্ধতা ভালভাবে সহ্য করতে পারে তবে বন্যার পানি সহিষ্ণু ক্ষমতা খুবই ভাল। এটি একটি সপুষ্পক ইক্ষুজাত। বৃহত্তর জয়পুরহাট, রাজশাহী, চুয়াডাংগা, পাবনা ও জামালপুর জেলার জন্য জাতটি বিশেষভাবে উপযোগী।

ঈশ্বরদী ৩০ ঃ

এ জাতটি আগাম পরিপক্ক এবং মধ্যম মোটা ধরণের জাতটি ২০০০ সালে অবমুক্ত করা হয়। জাতটি মাঝারী ধরণের লম্বা। উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমিতে এর আবাদ ভাল হয়। এ জাতটির হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৭৮ টন। সর্বোচ্চ চিনি আহরণের হার

১০.৩৯% এবং গুড়ের গুনগত মান খুব ভাল। এটি একটি বন্যা সহিষ্ণু জাত এবং ও জলাবদ্ধতার প্রতি মাঝারী ধরনের সহিষ্ণু ক্ষমতা আছে। জাতটিতে ফুল হয় না ঈশ্বরদী ৩০ যদিও বাংলাদেশের সর্বত্রই চাষ করা যায় তবুও বৃহত্তর রংপুর, জামালপুর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, জয়পুরহাট, পাবনা, দিনাজপুর, সিরাজগঞ্জ, সিলেট, বরিশাল ও জয়দেবপুর অঞ্চলের জন্য বিশেষ উপযোগী।

ঈশ্বরদী ৩১ ঃ

লম্বা কান্ড বিশিষ্ট, মধ্যম মোটা এবং মধ্যম পরিপক্ক এজাতটি ২০০০ সালে অবমুক্ত করা হয়েছে। এটি উঁচু হতে মাঝারী উঁচু জমিতে আবাদযোগ্য। হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৯০ টন। সর্বোচ্চ চিনি আহরণের হার ১০.২১% এবং গুড়ের গুনগত মান ভাল। জাতটি খরা, বন্যা ও জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে। এটি একটি সপুষ্পক জাত। জাতটি বাংলাদেশের সকল অঞ্চলেই চাষ করা যায় তবে বৃহত্তর রংপুর, জামালপুর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, জয়পুরহাট, পাবনা, দিনাজপুর, পলাশবাড়ী, সিরাজগঞ্জ, সিলেট, বরিশাল এবং চাঁপাই-নবাবগঞ্জ অঞ্চলের জন্য বিশেষ উপযোগী।

ঈশ্বরদী ৩২ ঃ

লম্বা কান্ড বিশিষ্ট মধ্যম মোটা ও মধ্যম পরিপক্ক এজাতটি ২০০২ সালে অবমুক্ত করা হয়েছে। জাতটি উঁচু ও মধ্যম উঁচু জমিতে চাষ করা যায়। হেক্টর প্রতি গড় ফলন ১০৪ টন। সর্বোচ্চ চিনি আহরণের ক্ষমতা ১০.২৩% এবং গুড়ের গুনগত মান মধ্যম ধরণের। বন্যা, খরা ও জলাবদ্ধতায় সহিষ্ণুতার দিক থেকে জাতটি যথাক্রমে খুবই সহিষ্ণু, সহিষ্ণু ও মাঝারী ধরণের সহিষ্ণু। এটি একটি সপুষ্পক জাতের ইক্ষু। বৃহত্তর জামালপুর, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, জয়দেবপুর, পাবনা, ঠাকুরগাঁও ও জয়পুরহাট অঞ্চলের জন্য বিশেষ উপযোগী তবে বাংলাদেশের সর্বত্রই জাতটি চাষাবাদ করা যায়।

ঈশ্বরদী ৩৩ ঃ

একটি আগাম পরিপক্ক ইক্ষুজাত। লম্বা কান্ড বিশিষ্ট মধ্যম মোটা এজাতটি ২০০২ সালে অবমুক্ত করা হয়েছে। এটি আবাদের জন্য উঁচু ও মধ্যম উঁচু জমি বিশেষ উপযোগী। এজাতের হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৯৯ টন। সর্বোচ্চ চিনি আহরণের ক্ষমতা ১১.৩১%। গুড়ের গুনগত মান মধ্যম। জাতটি বন্যা ও খরা ভালভাবে সহ্য করতে পারে তবে জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু ক্ষমতা মাঝারী ধরণের। এটি একটি সপুষ্পক জাত। এ জাতের ইক্ষু বৃহত্তর জামালপুর, কুষ্টিয়া, জয়দেবপুর, ঠাকুরগাঁও, রাজশাহী, পাবনা ও জয়পুরহাট জেলার জন্য বিশেষ উপযোগী।

ঈশ্বরদী ৩৪ ঃ

এটি একটি প্রবর্তীত ইক্ষুজাত। বিও ৯১ নামের এ জাতটি ভারত হতে ১৯৯১ সালে আমদানী করা হয়। বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জাতটি বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদের জন্য উপযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়। মধ্যম পরিপক্ক, মধ্যম মোটা এবং মধ্যম লম্বা কান্ডবিশিষ্ট এ জাতটি ২০০২ সালে অবমুক্ত করা হয়েছে। উঁচু, মাঝারী উঁচু ও মধ্যম নীচু জমিতে এ জাতের আবাদ করা যায়। এর হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৯৩ টন। সর্বোচ্চ চিনি আহরণের হার ১০.৬৮%। গুড়ের গুনগত মান মধ্যম। জাতটি বন্যা, খরা ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু। এ জাতে ফুল হয় না। ঈশ্বরদী ৩৪ জাতটি বৃহত্তর জামালপুর, জয়দেবপুর, কুষ্টিয়া, পাবনা, রাজশাহী, ঠাকুরগাঁও ও জয়পুরহাট জেলায় আবাদের জন্য বিশেষ উপযোগী তবে বাংলাদেশের সকল এলাকায়ই জাতটির আবাদ করা যায়।

ঈশ্বরদী ৩৫ ঃ

আগাম পরিপক্ক ঈশ্বরদী ৩৫ জাতটি সংকরণ ও বাছাইকরণের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয় এবং ২০০৩ সালে মুক্তিলাভ করে। জাতটি উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমিতে চাষযোগ্য। আখ সাধারণতঃ ২.৮০-৩.০০ মিঃ লম্বা হয়। ঝাড়প্রতি মাড়াইযোগ্য আখের সংখ্যা ৪-৮টি। এলাকাভেদে হেক্টরপ্রতি ৮৩-১১৫ টন ফলন পাওয়া যায়। চিনি আহরণের হার সর্বোচ্চ ১১.০২%। ঈশ্বরদী ৩৫ উন্নতমানের গুড় তৈরীর জন্য উপযুক্ত। খরা-সহিষ্ণু এ জাতটি বন্যা ও জলাবদ্ধতায় মাঝারী ধরণের সহিষ্ণু। লালপচা রোগে ভালভাবে থেকে মাঝারী ধরণের প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন এ জাতটি দেশের সকল জেলায়ই চাষ করা যায় তবে জামালপুর, চুয়াডাঙ্গা, গাজীপুর, জয়পুরহাট, পাবনা, রাজশাহী ও ঠাকুরগাঁও জেলার জন্য বিশেষ উপযোগী।

ঈশ্বরদী ৩৬ ঃ

সংকরণ ও বাছাইকরণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবিত ঈশ্বরদী ৩৬ নামক জাতটি ২০০৩ সালে অবমুক্ত হয়। এটি একটি আগাম পরিপক্ক জাত। উঁচু হতে মাঝারী উঁচু জমিতে আবাদ করা যায়। প্রতিঝাড়ে মাড়াইযোগ্য আখের সংখ্যা ৪-৯টি থাকে যা সাধারণতঃ ২.৭০-৩.১০ মিঃ লম্বা হয়। হেক্টরপ্রতি ৮০-৯৯ টন এবং সর্বোচ্চ চিনি আহরণের হার ১১.৪৯% এ জাতটি উন্নতমানের গুড় তৈরীর জন্য উপযুক্ত। জাতটি বন্যা, খরা ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু। লালপচা রোগে ভাল থেকে মাঝারী ধরণের প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ঈশ্বরদী ৩৬ জাতটি বৃহত্তর জয়পুরহাট, পাবনা, চুয়াডাঙ্গা, গাজীপুর, জামালপুর, রাজশাহী ও ঠাকুরগাঁও জেলায় চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী।

বিএসআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত ইক্ষু জাতের অবমুক্তির সন, ফলন, চিনি আহরণ হার ও পরিপক্কতার ধরণ

জাতের নাম	অবমুক্তির সন	সর্বোচ্চ গড় ফলন (টন/হেক্টর)	সর্বোচ্চ চিনি আহরণ হার (%)	পরিপক্কতার ধরণ	মন্তব্য
ঈশ্বরদী ২-৫৪	১৯৬৭	৮৩.০	১০.০০	মধ্যম	
এলজেসি	১৯৮২	৯৯.০	১০.৭৫	মধ্যম	
ঈশ্বরদী ১৫*	১৯৭৪	১৩৩.৫	১০.২০	নাবি	* বিএস ৯৬
ঈশ্বরদী ১৬	১৯৮১	১০২.০	১২.২৮	আগাম	
ঈশ্বরদী ১৭	১৯৮৪	১১২.০	১২.১৩	- - -	প্রথমে পচিক এলাকায় লালপচা রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণে ঈশ্বরদী ১৭ এর চাষাবাদ বন্ধ করা হয়, পরবর্তীতে সকল চিনিকল এলাকায় লালপচা রোগের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত
ঈশ্বরদী ১৮	১৯৮৮	৯৭.০	১০.৭২	মধ্যম	রাচিক ও কুচিকসহ সকল চিনিকল এলাকায় লালপচা রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণে ঈশ্বরদী ১৮ এর চাষাবাদ বন্ধ করা হয়,
ঈশ্বরদী ১৯	১৯৮৮	৯৭.০	১১.০৬	মধ্যম	তবে উঁচু জমিতে এখনও ব্যাপকভাবে চাষাবাদ হচ্ছে কারণ এর খুব ভাল বৃদ্ধি হয়। গুড়ের জন্য উপযোগী জাত
ঈশ্বরদী ২০	১৯৯০	৮৩.০	১১.০২	মধ্যম	
ঈশ্বরদী ২১	১৯৯০	৮৭.০	১২.১০	আগাম	
ঈশ্বরদী ২২	১৯৯৩	৮৭.০	১১.৩৪	আগাম	
ঈশ্বরদী ২৪	১৯৯৩	৬৮.০	১০.৯৮	আগাম	ঈশ্বরদী ২৪ এর আবাদে কুচিক, শ্যাচিক, ফচিক, রাচিক ও নবেচিক এলাকায় লালপচা রোগের প্রাদুর্ভাব।
ঈশ্বরদী ২৫	১৯৯৩	৮৭.০	১০.৫৬	মধ্যম	
ঈশ্বরদী ২৬	১৯৯৫	৭১.০	১১.৮০	আগাম	ঈশ্বরদী ২৬ জাতটি ঈশ্বরদী ১৬ এর মিউট্যান্ট। গাজীপুর/শ্রীপুর এলাকায় গুড়ের জন্য উপযোগী
ঈশ্বরদী ২৭	১৯৯৫	৭৯.০	১২.৪০	আগাম	ঈশ্বরদী ২৭ এর আবাদে নবেচিক এলাকায় লালপচা রোগের প্রাদুর্ভাব
ঈশ্বরদী ২৮	১৯৯৬	৯০.০	১১.৩০	মধ্যম	রাচিক, কুচিক, পচিক জচিক, শ্যাচিক ও নবেচিক এলাকায় লালপচা রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণে ঈশ্বরদী ২৮ এর চাষাবাদ বন্ধ করা হয়েছে
ঈশ্বরদী ২৯	১৯৯৮	৯৩.০	১০.৮৭	মধ্যম	
ঈশ্বরদী ৩০	২০০০	১১০.০	১০.৩৯	আগাম	ঈশ্বরদী ২৯ এর আবাদে নবেচিক ও কুচিক এলাকায় লালপচা রোগের প্রাদুর্ভাব।
ঈশ্বরদী ৩১	২০০০	১১৩.০	১০.২১	মধ্যম	রাচিক, কেরু, নাচিক, শ্যাচিক ও পাবনা এলাকায় কাণ্ডের মাজরা পোকার প্রাদুর্ভাবের কারণে ঈশ্বরদী ৩১ এর চাষাবাদ
ঈশ্বরদী ৩২	২০০২	১০৪.০	১০.২৩	মধ্যম	নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।
ঈশ্বরদী ৩৩	২০০২	৯৮.০	১১.৫১	আগাম	ঈশ্বরদী ৩৩ জাতটি গুড়ের জন্য উপযোগী।
ঈশ্বরদী ৩৪	২০০২	৯৩.০	১০.৬৮	মধ্যম	ঈশ্বরদী ৩৪ জাতটি গুড়ের জন্য উপযোগী।
ঈশ্বরদী ৩৫	২০০৩	৯৪.০	১১.০২	আগাম	
ঈশ্বরদী ৩৬	২০০৩	৮৯.০	১১.৪৯	আগাম	
অমৃত		১৩৪.০	১০.০১	- - -	অমৃত জাতটি মূলত চিবিয়ে খাওয়া ও গুড়ের জন্য উপযোগী।

পচিক = পঞ্চগড় চিনিকল
রাচিক = রাজশাহী চিনিকল
কুচিক = কুষ্টিয়া চিনিকল
শ্যাচিক = শ্যামপুর চিনিকল
ফচিক = ফরিদপুর চিনিকল
নবেচিক = নর্থ বেঙ্গল চিনিকল
পাচিক = পাবনা চিনিকল
জচিক = জয়পুরহাট চিনিকল
কেরু = কেরু এন্ড কোং চিনিকল
নাচিক = নাটোর চিনিকল

জমি নির্বাচন ও জমি প্রস্তুতি

জাত নির্বাচনের পরেই যে বিষয়টি সম্মুখে আসে তা হল জমি নির্বাচন। প্রকৃতপক্ষে জমির প্রকৃতির উপর নির্ভর করেই ইক্ষুর জাত নির্বাচন করতে হয়। ইক্ষু উঁচু জমির ফসল। তাই সফলভাবে ইক্ষুচাষের জন্য উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমিই নির্বাচন করা উচিত। পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থাযুক্ত দো-আঁশ বা এটেল দো-আঁশ মাটি ইক্ষুচাষের জন্য উপযুক্ত।

ইক্ষুচাষের জন্য–

ক) নির্বাচন করুন ঃ উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমি, পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থাযুক্ত দো-আঁশ বা কাদা দো-আঁশ মাটি এবং সমতল ভূমি।

খ) বর্জন করুন ঃ নিচুজমি (যেখানে এক মাসের বেশি বৃষ্টির পানি বা বন্যার পানি জমে থাকে), বালিমাটি কিম্বা জলাবদ্ধ জমি।

খরা, বন্যা, ও জলাবদ্ধতা বর্তমানে সারাদেশেরই সমস্যা। তাছাড়া দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আবাদযোগ্য জমিগুলোতে বর্তমানে লবনাক্ততাও একটি বড় সমস্যা হিসেবে দেখা যাচ্ছে। সেজন্যই বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট সকল প্রতিকূল জমিতেই চাষোপযোগী ইক্ষুজাত উদ্ভাবন করেছে। প্রতিকূল পরিবেশ (খরা, বন্যা, জলাবদ্ধতা ও লবনাক্ততা) সহিষ্ণু ইক্ষুজাতসমূহ হলঃ ঈশ্বরদী ২০, ঈশ্বরদী ২১, ঈশ্বরদী ২২, ঈশ্বরদী ২৪, ঈশ্বরদী ২৫, ঈশ্বরদী ২৬, ঈশ্বরদী ২৭, ঈশ্বরদী ২৮, ঈশ্বরদী ২৯, ঈশ্বরদী ৩০, ঈশ্বরদী ৩১, ঈশ্বরদী ৩২, ঈশ্বরদী ৩৩ ও ঈশ্বরদী ৩৪।

খরা প্রবণ এলাকায় ইক্ষু চাষে করণীয় ঃ

- খরা সহিষ্ণু ইক্ষুজাত রোপণ করতে হবে।
- ৩০ নভেম্বরের মধ্যেই ইক্ষু রোপণ সম্পন্ন করতে হবে।
- ২৫-৩০ সেঃমিঃ গভীর নালায় ইক্ষু রোপণ করতে হবে।
- ইক্ষু রোপণের সময় সুপারিশকৃত মাত্রায় রাসায়নিক/জৈব সার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
- ইক্ষু রোপণের সময় পটাশ সারের সুপারিশকৃত মাত্রার অতিরিক্ত হিসাবে হেক্টর প্রতি ৮২ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে।
- ইক্ষু রোপণের পর পরই ইক্ষুর গোড়ায়/নালায় ১০-১৫ সেঃমিঃ পুরু করে ট্রাস (Trash) দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- নালায় (Trench) জৈব সার (গোবর/কম্পোষ্ট/প্রেসমাড/খৈল) সুপারিশকৃত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।
- সেচ সুবিধা থাকলে খরার সময় সেচ দিতে হবে।
- খরা চলাকালীন সময় ইক্ষুর পাতার ২/৩ অংশ কর্তন করতে হবে।

জলাবদ্ধতা প্রবণ এলাকায় ইক্ষু চাষে করণীয় ঃ

- জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু ইক্ষুজাত রোপণ করতে হবে ।
- ১৫ ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই ইক্ষু রোপণ সম্পন্ন করতে হবে ।
- ইক্ষু রোপণের সময় সুপারিশকৃত মাত্রায় রাসায়নিক/জৈব সার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে ।
- ১৫ মার্চের মধ্যেই উপরিসার (একবার) প্রয়োগ করতে হবে ।
- ১৫ জুনের মধ্যেই ইক্ষুর গোড়ায় মাটি দিতে হবে ।
- ইক্ষু রোপণের পর তিন মাস ইক্ষুর আগাছা দমন ও মাল্‌চিং (Mulching) নিশ্চিত করতে হবে ।
- মৌসুমী বৃষ্টি শুরু হলে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে ।
- জুন/জুলাই/আগষ্ট মাসে ইক্ষুর মরা/পুরাতন পাতা এবং প্রতি ঝাড়ে ৫-৬টি সুস্থ কুশি রেখে অতিরিক্ত কুশি কর্তন করতে হবে ।
- ইক্ষুর জমি জলাবদ্ধ হওয়ার আগেই ইক্ষুর গোড়ায় মাটি দিতে হবে এবং ইক্ষু বেঁধে দিতে হবে ।
- জলাবদ্ধ অবস্থায় জমিতে উৎপাদিত জলজ উদ্ভিদ (ঘাস) এবং শ্যাওলা দমন করতে হবে ।
- ইক্ষুর জমি হ'তে পানি নেমে গেলে যথাসম্ভব দ্রুত ইক্ষু কর্তন/মাড়াই করতে হবে ।

বন্যা প্রবণ এলাকায় ইক্ষু চাষে করণীয় ঃ

- বন্যাসহিষ্ণু ইক্ষুজাত রোপণ করতে হবে ।
- ১৫ ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই ইক্ষু রোপণ সম্পন্ন করতে হবে ।
- ইক্ষু রোপণের সময় সুপারিশকৃত মাত্রায় রাসায়নিক/জৈব সার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে ।
- ১৫ মে এর মধ্যেই উপরি সার (একবার) প্রয়োগ করতে হবে ।
- ইক্ষু রোপণের পর তিন মাস ইক্ষুর আগাছা দমন ও মাল্‌চিং (Mulching) নিশ্চিত করতে হবে ।
- জুন/জুলাই/আগষ্ট মাসে ইক্ষুর মরা/পুরাতন পাতা এবং প্রতি ঝাড়ে ৫-৬টি সুস্থ কুশি রেখে অতিরিক্ত কুশি কেটে দিতে হবে ।
- ইক্ষুর জমি বন্যায় প্লাবিত হওয়ার আগেই ইক্ষুর গোড়ায় মাটি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে ।
- জমিতে স্রোতের ফলে ইক্ষুর ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে জমির আইল (সীমানা) বরাবর ধৈঞ্চা বপন করতে হবে ।
- ইক্ষুর জমি থেকে পানি নেমে গেলে যথাসম্ভব দ্রুত ইক্ষু কর্তন/মাড়াই করতে হবে ।

জমি তৈরী ঃ

ইক্ষু একটি দীর্ঘমেয়াদী, লম্বা ও ঘন শিকড়বিশিষ্ট ফসল। সেজন্য ইক্ষুর জমি সুন্দরভাবে গভীর করে চাষ দিতে হয় যেন শিকড়গুচ্ছ সহজেই মাটিতে প্রবেশ করে অবাধে তার প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান সংগ্রহ করতে পারে।

জমি তৈরীর উদ্দেশ্য ঃ

- মাটির পানি শোষণ ক্ষমতা বাড়ানো
- একটি উত্তম বীজতলা তৈরী
- মাটিতে বাতাস চলাচলের সুযোগ বৃদ্ধি করা
- জৈব পদার্থ প্রয়োগ করে মাটির উর্বরতা বাড়ানো
- আগাছা নিয়ন্ত্রণ ও দমন
- মাটিতে, বিকল্প পোষকে এবং ফসলের অবশিষ্টাংশে থাকা রোগ-জীবানু ও কীট-পতঙ্গ ধ্বংশ করা
- নীচের মাটি শক্ত ও স্তরীভূত হয়ে থাকলে তা ভেঙে দেয়া

জমি তৈরীর উপযুক্ত সময় ঃ মাটির ধরণ ও মাটিতে অবস্থিত আদ্রতার উপর নির্ভর করে জমি চাষের উপযুক্ত সময় নির্বাচন করতে হয়। বেশি ভেজামাটি বা বেশি শুষ্কমাটি কোনটিই জমি তৈরীর জন্য উপযুক্ত নয়। বেশি ভেজা মাটিতে চাষ দিলে জমি কর্দমাক্ত হয় এবং পরে তা শুকিয়ে বড় বড় ঢিলের সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে বেশি শুষ্ক মাটিতে চাষ করা কঠিন এবং তা বেশি গভীর হয় না। তাই কেবলমাত্র জো আসলেই জমি চাষ করতে হয়।

জমি চাষের গভীরতা ঃ ইক্ষুচাষের জন্য ৮ ইঞ্চি গভীর করে জমি চাষ দেয়া দরকার। দেশী লাঙ্গলের দ্বারা এই পরিমাণ গভীর করে জমি চাষ দেয়া যায় না। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সর্বোচ্চ গভীর করে চাষ দেয়া হয়।

জমি চাষের উপায় ঃ নিম্নলিখিত পাঁচটি উপায়ে জমি চাষ দেয়া যেতে পারে–

- কোদালের সাহায্যে
- দেশী লাঙ্গলের সাহায্যে
- মোল্ডবোর্ড লাঙ্গলের সাহায্যে
- পাওয়ার টিলারের সাহায্যে
- ট্রাক্টরের সাহায্যে

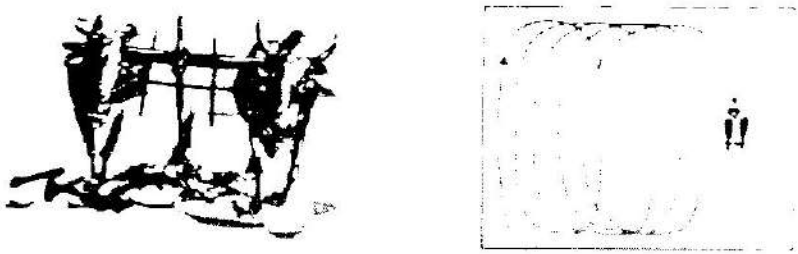

গরুর লাঙ্গলের চাষ দেয়ার সঠিক পদ্ধতি

কোদালের সাহায্যে কেবলমাত্র অল্প জমিতে চাষ করা যেতে পারে। এ পদ্ধতি তাই ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। তবে এতে গভীরভাবে চাষ দেয়া যায়। দেশী লাঙ্গল দিয়েই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চাষাবাদ হয়। তবে এতে গভীরভাবে চাষ দেয়া যায় না। মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল দিয়ে গভীরভাবে চাষ করা গেলেও এর প্রধান সমস্যা হলো দূর্বল হালের পশু এ লাঙ্গল টানতে পারে না। পাওয়ার টিলারের সাহায্যেও জমি চাষ করা যায়। তবে এতেও গভীরভাবে চাষ দেয়া যায় না। সম্প্রতি বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট পাওয়ার টিলারের সাহায্যে ট্রেঞ্চ/ নালা তৈরীর জন্য বিশেষ ধরণের ট্রেঞ্চার উদ্ভাবন করেছে। ট্রাক্টরের সাহায্যে অনেক বড় জমি অল্প সময়ে এবং অনেক গভীরভাবে (এমনকি ১৪-১৫ ইঞ্চি গভীর করে) চাষ করা যায়। তবে এর প্রাথমিক খরচ বেশি তাই এটা সমবায়ের মাধ্যমে অথবা ভাড়া পদ্ধতিতে চাষীদের ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করা উচিত।

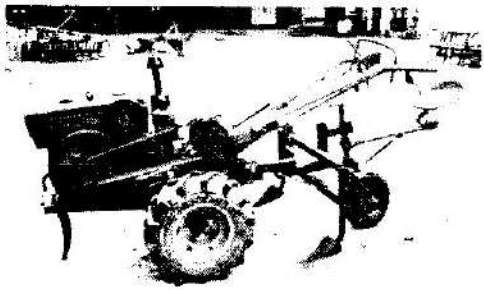

বিএসআরআই উদ্ভাবিত পাওয়ার টিলার ট্রেঞ্চার

কতবার জমি চাষ দিতে হবে তা নির্ভর করে জমির প্রকৃতি, চাষের সময় মাটিতে রসের পরিমাণ ও আবহাওয়ার উপর। যেমন বেলে দোয়াশ মাটিতে চাষের সংখ্যা এটেল দোয়াশ মাটির চেয়ে কম। একটি আদর্শ জমি তৈরীর জন্য ৫-৬টি চাষই যথেষ্ট। জমিতে প্রথমে একটি চাষ দিয়ে কয়েকদিন ফেলে রাখতে হবে এরপর মই দিয়ে সমান করে পরবর্তী চাষ দিতে হবে। পরবর্তী চাষের জন্য কতদিন অপেক্ষা করতে হবে তা নির্ভর করে মাটিতে রসের পরিমাণের উপর। মাটিতে বেশী রস থাকা অবস্থায় প্রথম চাষ দেয়া হলে ঐ রস শুকানোর জন্য বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়। তবে জো আসার পর প্রথম চাষ দেয়া হলে ২-৫ দিনের মধ্যেই পরবর্তী চাষ দেয়া যেতে পারে।

বীজ নির্বাচন ও বীজ তৈরী ঃ

বীজ নির্বাচন ঃ কথায় আছে ভাল বীজে ভাল ফসল। ভাল বীজের বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে–

- ভাল অংকুরোদ্গম ক্ষমতা
- সুস্থ ও সবল
- রোগ ও পোকামাকড় মুক্ত
- অনুমোদিত/সার্টিফাইড বীজক্ষেত থেকে নেয়া

বীজের জন্য আলাদাভাবে বীজক্ষেত তৈরী করে উপযুক্ত যত্ন ও পরিচর্যার সাধ্যমে বীজক্ষেত রোগবালাই ও পোকামাকড় মুক্ত রাখতে হবে। এভাবে বেড়ে ওঠা সুস্থ ও সবল বীজক্ষেতের আখই বীজ হিসেবে ব্যবহার করা উচিত। বীজআখের বয়স ৮-৯ মাসের হওয়া উচিত। বীজআখ দূরে কোথাও নিয়ে যেতে হলে তা পাতা না ছাড়িয়েই নিয়ে যাওয়া উচিত এবং পরিবহনের সময় সতর্ক থাকা উচিত যেন আখের চোখের কোন ক্ষতি না হয়।

বীজ তৈরী ঃ নির্বাচিত প্রত্যায়িত বীজক্ষেত থেকে ধারালো দা বা হাসুয়া দিয়ে খুব সাবধানে আখ কাটতে হবে। এসময় লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো–

- শুধুমাত্র অনুমোদিত জাতের আখই গ্রহণ করতে হবে
- আট থেকে নয় মাস বয়সের আখ কাটতে হবে
- জাত বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ বিকাশসহ উন্নতমানের আখ নির্বাচন করতে হবে
- রোগ মুক্ত বীজ নির্বাচন করতে হবে
- পোকামাকড় মুক্ত বীজ নির্বাচন করতে হবে। (নিতান্ত প্রয়োজন হলে পোকা খাওয়া অংশ বাদ দিয়ে বীজ নেয়া যেতে পারে।)
- শিকড় গজানো অংশ অবশ্যই বাদ দিতে হবে।
- নিখুঁত চোখযুক্ত ইক্ষুগাছগুলিই শুধুমাত্র নির্বাচন করতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কাটার সময় চোখের কোন ক্ষতি না হয়।
- আখ কাটার আগে ব্যবহারের দা বা হাসুয়াটি অবশ্যই জীবানুমুক্ত করে নিতে হবে।
  - আখের মরা পাতা জড়ো করে তাতে আগুন ধরিয়ে দা বা হাসুয়া জীবানুমুক্ত করা যায়। উত্তপ্ত দা বা হাসুয়ার গায়ে ২/৩ ফোঁটা পানি দিলে যদি কড় কড় শব্দ করে শুকিয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে তা জীবানুমুক্ত হয়েছে।
  - শতকরা ৫ ভাগ 'লাইসল' দ্রবনের মধ্যে দা বা হাসুয়া ডুবিয়ে নিলেও তা জীবানু মুক্ত হয়।

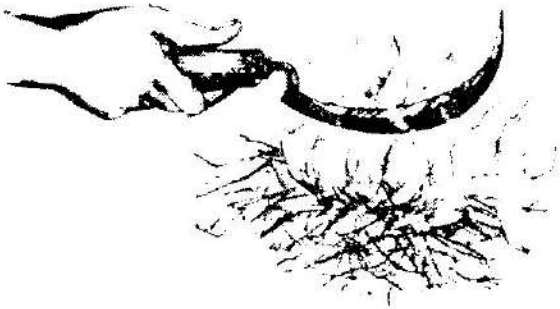

দা বা হাসুয়া আগুনে ছেকে জীবানুমুক্তকরণ

বপন/রোপন পদ্ধতির উপর নির্ভর করে এক, দুই বা তিন চোখবিশিষ্ট বীজখন্ড তৈরী করতে হয়।

এক চোখ বিশিষ্ট বীজ খন্ড তৈরী ঃ অল্প বীজ থেকে অধিক পরিমাণ চারা করার প্রয়োজন হলে এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। নতুন কোন ইক্ষুজাতের দ্রুত বিস্তারের জন্য এটি একটি উত্তম কৌশল। এক চোখ করে বীজ খন্ড তৈরী করতে হয় নিম্নলিখিত উপায়ে চাষাবাদের জন্য।

- পলিব্যাগ পদ্ধতিতে রোপা আখ চাষের জন্য
- রাইউনগান পদ্ধতিতে আখ চাষের জন্য
- বাড্ চিপ পদ্ধতিতে আখ চাষের জন্য

দুই চোখ বিশিষ্ট বীজ খন্ড তৈরী ঃ দুই চোখ করে বীজ খন্ড তৈরী করতে হয় নিম্নলিখিত উপায়ে চাষাবাদের জন্য।

- বেড চারা পদ্ধতিতে রোপা আখ চাষের জন্য
- স্টকলেস পদ্ধতিতে আখ চাষের জন্য

তিন চোখ বিশিষ্ট বীজ খন্ড তৈরী ঃ তিন চোখ করে বীজ খন্ড তৈরী করতে হয় প্রচলিত পদ্ধতিতে চাষাবাদের জন্য।

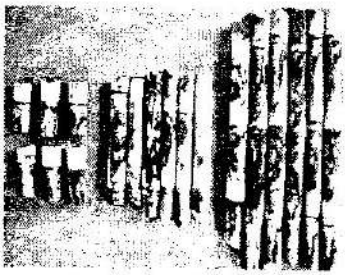

এক, দুই ও তিন চোখ বিশিষ্ট বীজ আখ

সহজে বীজ কাটার জন্য বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট বেশকিছু যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে। পরবর্তী অধ্যায়ে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হ'ল।

বীজ শোধন ঃ মাটিতে অবস্থিত রোগ-জীবানু হতে বীজ আখকে রক্ষা করার জন্য রোপনের আগেই বীজ শোধন করে নিতে হয়। এক লিটার পানিতে এক গ্রাম ব্যাভিস্টিন নামক রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা বীজইক্ষু শোধন করা যেতে পারে।

প্রচলিত ইক্ষুচাষ পদ্ধতি

প্রচলিত ইক্ষু চাষ পদ্ধতি বলতেই আমরা বুঝি তিন চোখবিশিষ্ট ইক্ষুবীজ ব্যবহারের মাধ্যমে ইক্ষু চাষ করার পদ্ধতি। সাধারণতঃ বিভিন্ন ফসল ধারা অনুসরণ করে পাট অথবা আউশ ধান কাটার পর ইক্ষুর আবাদ করা হয়। বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট ইক্ষুভিত্তিক ফসলধারার উপর গবেষণা করে নিম্নলিখিত বেশ কয়েকটি ফসলধারা সুপারিশ করেছে।

সুপারিশকৃত পাঁচটি উন্নত ফসলধারা ঃ

১. পাট-ইক্ষু+মুড়ি ইক্ষু
২. পাট- ইক্ষু +সাথীফসল
৩. পাট-মাটিকালাই- ইক্ষু
৪. আউশ ধান- ইক্ষু + সাথীফসল (আলু/পিঁয়াজ/রসুন)-মুড়ি ইক্ষু
৫. পাট-জোড়া সাড়ি ইক্ষু +১ম সাথীফসল (আলু/পিঁয়াজ/রসুন/ডাল/সব্জি)-২য় সাথীফসল (মুগডাল/লাল শাক/গীমা কলমী/সবুজ সার)-মুড়ি ইক্ষু + সাথীফসল (সবুজ সার)

ইক্ষু রোপণের সময় ঃ আগাম রোপণকৃত ইক্ষু সবসময়ই নবীতে রোপণকৃত ইক্ষুর চেয়ে অধিক ফলন দেয় এবং তাতে এক বা একাধিক সাথীফসল চাষ করা যায়। তাই বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট আগাম ইক্ষুচাষের সুপারিশ করেছে। আগাম ইক্ষু রোপণের উপযুক্ত সময় সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত। এসময় ইক্ষু লাগালে নিম্নোক্ত সুবিধা পাওয়া যায়।

১. মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকে
২. মাটিতে সন্তোষজনক তাপমাত্রা থাকে
৩. ভাল অংকুরোদ্গম হয়
৪. প্রচুর শিকড় হয়ে মাটির গভীরে প্রবেশ করে ফলে খরা মৌসুমের প্রতিকূল আবহাওয়া সহজেই সহ্য করতে পারে
৫. অধিক কুশি গজায়

- কম বীজ লাগে
- একাধিক সাথী ফসলের চাষ করা যায়

রোপণের দূরত্ব ঃ

এঁটেল ও দোয়াশ মাটির জন্য–

- আগাম চাষ করা হলে সারি থেকে সারির দূরত্ব : ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি
- নামলা চাষের ক্ষেত্রে : ৩ ফুট

বেলে/বেলে দোঁয়াশ মাটির জন্য–

- আগাম চাষ করা হলে সারি থেকে সারির দূরত্ব : ৩ ফুট
- নামলা চাষের ক্ষেত্রে : ২ ফুট ৬ ইঞ্চি

নালা তৈরী ঃ নিম্নোক্ত বিভিন্নভাবে নালা তৈরী করা যায়–

- ট্রাক্টর এবং ট্রেঞ্চারের সাহায্যে
- পাওয়ার টিলার এবং ট্রেঞ্চারের সাহায্যে
- কোদাল দিয়ে
- গরুর সাহায্যে লাঙ্গল দিয়ে

নালার গভীরতা ৮-৯ ইঞ্চি (২০-২৫ সেমি) হওয়া উচিত। ট্রেঞ্চারের সাহায্যে প্রস্তুতকৃত নালার আকৃতি 'ভি' (V) সদৃশ। কোদালের সাহায্যে তৈরীকৃত নালার গভীরতা ঠিক হলেও তাতে খরচ বেশী পড়ে তাই ট্রেঞ্চারের সাহায্যেই নালা করার ব্যবস্থা করা ভাল।

নালায় বীজ স্থাপন ঃ নালায় বীজ স্থাপনের পদ্ধতি চার ধরণের–

১. মাথায় মাথায় বা চলমান একসারি পদ্ধতি ঃ আগাম ইক্ষু চাষের ক্ষেত্রে যেখানে প্রচুর রস আছে অথচ উঁইয়ের উপদ্রব নেই সেখানে এ পদ্ধতি প্রযোজ্য। এতে একরপ্রতি প্রায় ৬০ মণ বীজইক্ষু দরকার।

২. দেড়া বা একখন্ডের মাঝে আরেক খন্ড স্থাপন পদ্ধতি ঃ বেলে মাটিতে মধ্যম বা নামলা ইক্ষু চাষের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রযোজ্য। এতে একরপ্রতি প্রায় ৮০-৯০ মণ বীজইক্ষু দরকার।

৩. দুই সারি পদ্ধতি ঃ বেলে মাটিতে বা নামলা চাষের ক্ষেত্রে যখন মাটিতে রসের পরিমাণ খুবই কম কিংবা উঁইয়ের উপদ্রব আছে সেখানে এ পদ্ধতি প্রযোজ্য। এতে একরপ্রতি প্রায় ১০০-১২০ মণ বীজইক্ষু দরকার।

৪. আঁকা-বাঁকা পদ্ধতি ঃ উঁইয়ের উপদ্রব যেখানে বেশী আছে সেখানে এ পদ্ধতি প্রযোজ্য। এতে একরপ্রতি প্রায় ১২০-১৪০ মণ বীজইক্ষু দরকার।

ইক্ষুচাষের উন্নত পদ্ধতি

(উন্নত ইক্ষুজাত বিষয়ক চিত্রাবলী পৃষ্ঠা ৮৫-৮৮ দ্রষ্টব্য)

প্রচলিত পদ্ধতিতে ইক্ষু চাষ করতে তিন চোখ বিশিষ্ট ইক্ষুর বীজখন্ড ব্যবহার করা হয় এবং তা সরাসরি মূল জমিতে বপন করা হয়। এতে একরপ্রতি অনেক বেশী (৬০-১২০ মণ) বীজ লাগে এবং জমিতে বিভিন্ন ধরণের সমস্যা দেখা যায়। প্রথম সমস্যা হয় অঙ্কুরোদ্গমে। কারণ অনুকুল পরিবেশেও রোপণকৃত চোখের মাত্র শতকরা ৩০-৪৫ ভাগ গজায়। বাকি ৫৫-৭০ ভাগ চোখ গজায় না। বাংলাদেশে প্রচলিত পদ্ধতিতে সাধারণতঃ সেপ্টেম্বর (মধ্য ভাদ্র) মাস হ'তে ফেব্রুয়ারী (মধ্য ফাল্গুন) মাস পর্যন্ত ইক্ষু রোপণ করা হয়। এসময় অপর্যাপ্ত এবং অনিয়মিত অংকুরোদগমের প্রধান কারণ নিম্নরূপ ঃ

- **বাতাসের তাপমাত্রা ঃ** নিম্ন তাপমাত্রায় অর্থাৎ রাতের তাপমাত্রা ২০° সে. এর নীচে হ'লে ইক্ষুর অংকুরোদগম ভাল হয় না। ১৬° সে. এর নীচের তাপমাত্রায় অংকুরোদগম প্রক্রিয়া শুরু হ'তে পারে না। ভাল অংকুরোদগমের জন্য ৩০°-৪০° সে. তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। দিনের (উচ্চ) তাপমাত্রা অপেক্ষা রাতের (নিম্ন) তাপমাত্রা অংকুরোদগমের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য বাতাসের তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে মাটির তাপমাত্রারও তারতম্য হয়ে থাকে।
- **মাটির রস ঃ** জমিতে (মাটিতে) প্রয়োজনীয় রস থাকে না।
- **অগ্রপ্রাধান্য ঃ** প্রচলিত পদ্ধতিতে তিন চোখবিশিষ্ট বীজ খন্ড রোপণ করা হয়। অগ্রপ্রাধান্যর কারণে আগার দিকের চোখটি বা যে কোন একটি আগে গজালে নীচের চোখ বা বাকী দুটি গজাতে পারে না। ফলে অংকুরোদগম কমে যায়।
- **রিডিউসিং সুগার ঃ** ইক্ষু বীজে রিডিউসিং সুগার এর পরিমাণ কম-বেশী হওয়াতে অংকুরোদগমও কম বেশী হয়। রিডিউসিং সুগার বেশী হলে অংকুরোদগমও বেশী হয়।
- **সুপ্তাবস্থা ঃ** ইক্ষুর সুপ্তাবস্থার কারণেও অংকুরোদগমে ব্যাঘাত ঘটে।
- **বীজ নির্বাচন এবং বীজ বাছাই ঃ** ইক্ষুর উপরের অংশ নীচের অংশের চেয়ে বীজ হিসাবে ভাল। ভাল বীজে বেশী অংকুরোদগম হয়।
- **জমি তৈরী ঃ** ভাল জমি নির্বাচন এবং ভালভাবে জমি তৈরী করা হলে অংকুরোদগম বেশী হয়।
- **বীজ শোধন ঃ** বীজ শোধন করলে অংকুরোদগম বেশী হয়।
- **বীজ বপনের গভীরতা ঃ** বীজ বপনের গভীরতার জন্যও অংকুরোদগম কম-বেশী হয়।

অংকুরোদগম বৃদ্ধির সম্ভাব্য উপায়সমূহ ঃ

- **ইক্ষু বীজ বপনের পূর্বে পানিতে ডুবিয়ে রাখা ঃ** দুই বা তিন চোখ বিশিষ্ট ইক্ষুবীজ বপনের পূর্বে ১২-২৪ ঘন্টা পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে।
- **বীজ ইক্ষু বপনের পূর্বে শুকানো ঃ** বীজ ইক্ষু কাটার পর ৫-৭ দিন শুকাতে হবে এরপর দুই বা তিন চোখবিশিষ্ট বীজ-খন্ড তৈরী করে মূল জমিতে বপন করতে হবে। সেচ সুবিধে আছে এমন জমির ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি বেশী কার্যকর।
- **বীজ ইক্ষু বপনের পূর্বে শুকানো এবং পানিতে ডুবিয়ে রাখা ঃ** বীজ ইক্ষু কাটার পর (বপনের আগে) ৫-৭ দিন শুকিয়ে তারপর দুই বা তিন চোখবিশিষ্ট বীজ-খন্ড তৈরী করে ১২ ঘন্টা পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে এবং এরপর মূল জমিতে বপন করতে হবে। সেচ সুবিধে নেই এমন জমির ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি বেশী কার্যকর।
- **বীজ ইক্ষু রোপণের আগে গরম পানিতে শোধন করা ঃ** দুই বা তিন চোখবিশিষ্ট বীজ-খন্ড তৈরী করে ৪০-৫২° সে. তাপমাত্রায় ২৫-৩০ মিনিট শোধন করতে হবে। এরপর বীজখন্ডগুলো ঠান্ডা করে মূল জমিতে বপন করতে হবে।
- **বীজ বাছাই/বীজ নির্বাচন ঃ** রোগ মুক্ত, সুস্থ সবল এবং পোকা-মাকড় মুক্ত ইক্ষু বীজ হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। ইক্ষুর উপরের অর্দ্ধেক তুলনামূলকভাবে নীচের অর্দ্ধেকের চেয়ে বীজ হিসাবে ভাল।
- **জমি চাষ ঃ** ভালভাবে জমি তৈরী করতে হবে এবং ভাল "জো" অবস্থায় বীজ বপন করতে হবে। বিশেষ করে বাতাসের তাপমাত্রা কম হলে, জমি ভালভাবে তৈরী করার দিকে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে ।
- **বীজ শোধন ঃ** বীজ বপনের আগে অনুমোদিত ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজ শোধন করে মূল জমিতে বপন করতে হবে।

প্রচলিত পদ্ধতির আরো অনেক সমস্যা রয়েছে যা উন্নত পদ্ধতি বা রোপা পদ্ধতিতে দূর করা সম্ভব। এখানে প্রচলিত পদ্ধতির সাথে উন্নত পদ্ধতি বা রোপা পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা করা হ'ল।

রোপা ও প্রচলিত পদ্ধতির তুলনামূলক বিবরণ

- প্রচলিত পদ্ধতিতে একর প্রতি ৭০-৮০ মণ বীজ লাগে অথচ রোপা পদ্ধতির ক্ষেত্রে মাত্র ২০ মণ বীজ দরকার হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন গাছচারা বা রাইউনগান এবং বাডচিপ পদ্ধতিতে চারা করা হলে বীজের পরিমাণ আরো কম বা নেই বললেই চলে। কারণ গাছচারা বা বাডচিপের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইক্ষুর চোখটুকুই তুলে এনে বীজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বাকী পুরো ইক্ষু মিলে পাঠানো যায় কিংবা গুড়ের জন্য ভাঙানো যায়।

- প্রচলিত পদ্ধতিতে জমিতে কোথাও অনেক ফাঁকা জায়গা থাকে আবার কোথাও ঘনভাবে অংকুরোদ্গম হয় কিন্তু রোপা পদ্ধতির ক্ষেত্রে কখনোই তা হয়না বরং এতে সম্পূর্ণ জমিতে সুষমভাবে চারা বন্টন করা হয়।
- প্রচলিত পদ্ধতিতে একরপ্রতি মাড়াইযোগ্য আখের সংখ্যা ১৮-২২ হাজার হলেও রোপা পদ্ধতিতে মাড়াইযোগ্য আখের সংখ্যা ৪৫-৫০ হাজার হয়ে থাকে।
- প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রয়োগকৃত সার ও কীটনাশকের ব্যবহার উপযুক্তভাবে হয়না। কিন্তু রোপা পদ্ধতিতে ইক্ষুচারা পূর্ণ জমিতে সুসমভাবে থাকে ফলে প্রয়োগকৃত সার ও কীটনাশকের উপযুক্ত ব্যবহার হয়।
- প্রচলিত পদ্ধতিতে অনেকক্ষেত্রেই মাঠে দূর্বল ও লিকলিকে চারা গজায়। ফলে পোকামাকড় ও রোগবালাই এর আক্রমণ বেশি হয়। কিন্তু রোপা পদ্ধতিতে দূর্বল, লিকলিকে রোগ ও পোকা আক্রান্ত চারা বীজতলা থেকেই তুলে ফেলে দেয়া যায়।
- প্রচলিত পদ্ধতিতে বীজ অনেক বেশি লাগে ফলে বীজশোধনের সময় ও খরচ অনেক বেশি কিন্তু রোপা পদ্ধতিতে বীজের পরিমাণ কম লাগে ফলে বীজ শোধনের সময় ও খরচ অনেক কম।
- প্রচলিত পদ্ধতিতে ভিত্তিবীজের পরিমাণ কম হওয়ায় নতুন উদ্ভাবিত কোন ইক্ষুজাত মাঠ পর্যায়ে বিস্তার লাভ করতে অনেক বেশি সময় লাগে কিন্তু রোপা আখ চাষে ১৪৩০ অনুপাতে বীজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন উদ্ভাবিত কোন ইক্ষুজাত মাঠ পর্যায়ে অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করতে পারে।
- প্রচলিত পদ্ধতিতে ইক্ষুচাষের বপনকাল নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। কারণ বৃষ্টিপাত ও মাঠে জো আসতে দেরী হলে ইক্ষুচাষ বিলম্বিত হয় এবং ফলন কমে যায়। কিন্তু রোপা চাষের ক্ষেত্রে আখচাষের বপনকাল নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বৃষ্টিপাতের ফলে মাঠে জো আসতে দেরী হলেও বীজতলায় চারা করে আখের বয়স বাড়িয়ে নেয়া যায়। ফলে আগাম চাষ নিশ্চিত হয়।
- প্রচলিত পদ্ধতিতে আখের ফলন ও চিনি আহরণের হার কম হয়। রোপা পদ্ধতির চাষে প্রতিটি আখগাছই সমভাবে আলো বাতাস ও খাদ্য পাওয়ায় আখের ফলন ও চিনি আহরণ হার উভয়ই বৃদ্ধি পায়।

চারা উৎপাদন ঃ রোপা আখ চাষের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন হয় আখের চারা। আখের চারা বিভিন্নভাবে উৎপাদন করা যায়। যেমন-

- বীজতলায় চারা উৎপাদন
- পলিথিন ব্যাগে চারা উৎপাদন
- রাইউনগান পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন
- বাড চিপ পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন
- স্টকলেস পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন

বীজতলায় চারা উৎপাদন ঃ রোপা আখ চাষের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি এটি এ পদ্ধতিতে বীজআখকে দুই চোখবিশিষ্ট খন্ড করে বীজতলায় রেখে চারা উৎপন্ন করা হয়।

- মধ্য জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর (শ্রাবন-ভাদ্র) পর্যন্ত বীজতলা তৈরীর উপযুক্ত সময়।
- ২৪ ফুট দৈর্ঘ্যের ও ৪ ফুট প্রস্থের প্রতিটি বীজতলায় ২ মণ পচা গোবর/ কম্পোষ্ট/প্রেসমাড সার, ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ও ২৫০ গ্রাম এমপি সার প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। এ মাপের ১০টি বীজতলার চারা দিয়ে এক হেক্টর জমিতে আখ চাষ করা যায় (এক একরের জন্য দরকার হয় ৪টি)।
- অনুমোদিত জাতের সুস্থ ও সবল বীজআখ দুই চোখবিশিষ্ট খন্ড করে তা ছত্রাকনাশক ব্যাভিস্টিন (২০ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম) দিয়ে ৩০ মিনিট ডুবিয়ে রেখে শোধন করে নিতে হবে।
- বীজখন্ডগুলোর চোখ পাশাপাশি রেখে বীজতলায় মাটির সমান্তরালে স্থাপন করে তাতে হাল্কা (এক সে.মি.) করে মাটি দিয়ে দিতে হবে। এর উপর খড় বা আখের শুকনো পাতা দিয়ে ঢেকে দিয়ে প্রয়োজন হলে মাঝে মাঝে হাল্কা সেচ দিতে হবে।
- বীজতলায় রোগাক্রান্ত কোন চারা দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে তা তুলে পুড়িয়ে বা পুতে ফেলতে হবে। পোকার আক্রমণ দেখা দিলে তা সঙ্গে সঙ্গে দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- মূল জমি তৈরী সম্পন্ন হলে সেখানে ৬-৯ ইঞ্চি গভীর নালায় চারা লাগিয়ে তাতে ১.৫ ইঞ্চি মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

পলিথিন ব্যাগে চারা উৎপাদন ঃ একচোখ বিশিষ্ট বীজইক্ষ ৪×৫ ইঞ্চি আকারের পলিথিন ব্যাগে জৈবসার মিশ্রিত মাটিতে রেখে চারা তোলা হয়।

- এক একর জমির জন্য ৩০০০০ চারা দরকার। ০.০২ মি.মি. পুরুত্বের ৪-৫ ইঞ্চি আকারের পলিথিন ব্যাগ হলে ৮ কেজি পলিব্যগ (প্রতি কেজিতে ১৫০০) দরকার হবে।
- পলিথিন ব্যাগে মাটি ভরার আগে ব্যাগের নিচের দিকে ২/৩টি ছিদ্র করে দিতে হবে যাতে অতিরিক্ত পানি বেরিয়ে যেতে পারে।
- পলিথিন ব্যাগে ভরার জন্য ৫০ ভাগ বেলে দোয়াশ মাটি এবং ৫০ ভাগ জৈব সার মিশিয়ে নিতে হবে।
- অনুমোদিত জাতের সুস্থ ও সবল বীজইক্ষু একটি শক্ত কাঠের খন্ডের উপর রেখে তা একটি ধারালো হাসুয়া বা দা এর সাহায্যে এককোপে কেটে এক চোখবিশিষ্ট খন্ড করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, প্রতিটি বীজখন্ডের উপরের

- দিকে এক ইঞ্চি এবং নিচের দিকে ২ ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা থাকে এবং কাটার সময় যেন বীজখন্ডটি থেতলে না যায়। এরপর বীজখন্ডগুলোকে ছত্রাকনাশক ব্যাভিস্টিন (২০ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম) দ্বারা ৩০ মিনিট ডুবিয়ে রেখে শোধন করে নিতে হবে।
- চোখ উপরের দিকে রেখে পলিথিন ব্যাগে কিছুটা মাটি দিয়ে তার উপরে শোধিত বীজখন্ডটি বসিয়ে দিয়ে তার উপর হালকা করে (১/২ ইঞ্চি) মাটি দিয়ে দিতে হবে।
- এরপর হালকা রোদ পড়ে এমন জায়গায় বীজপূর্ণ ব্যাগগুলি সাজিয়ে রাখতে হবে এবং প্রয়োজন হলে হাল্কা সেচ দিতে হবে। ব্যাগের মধ্যে কচি চারার পাতা বেড়ে গেলে তা বারবার কেটে ছোট করে দিতে হবে।
- বীজতলায় রোগাক্রান্ত কোন চারা দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে তা তুলে পুড়িয়ে বা পুতে ফেলতে হবে। পোকার আক্রমণ দেখা দিলে তা সঙ্গে সঙ্গে দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- মূল জমি তৈরী সম্পন্ন হলে সেখানে ৬-৯ ইঞ্চি গভীর নালায় চারা লাগিয়ে তাতে ১.৫ ইঞ্চি মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। চারা লাগানোর জন্য পলিব্যাগগুলো প্রথমে ভিজিয়ে নিয়ে তারপর ব্লেড বা হাসুয়ার আচড় দিয়ে কেটে মাটিসহ চারা জমিতে রোপণ করতে হবে।

রোপণ দূরত্বের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় চারার সংখ্যা নির্ণয়

রোপণকাল	দূরত্ব				চারার সংখ্যা	
	সারি থেকে সারি		চারা থেকে চারা		হেক্টরপ্রতি	একরপ্রতি
	ফুট	সে.মি.	ফুট	সে.মি.		
আগস্ট - অক্টোবর (মধ্য শ্রাবন-মধ্য কার্তিক)	৩.২৫	১০০	২.০০	৬০	১৬৬০০	৬৬৪০
নভেম্বর-মধ্য ডিসেম্বর (মধ্য কার্তিক - অগ্রহায়ন)	৩.০০	৯০	১.৫০	৪৫	২৪২০০	৯৬৮০
মধ্য জানুয়ারী- ফেব্রুয়ারী (মাঘ- মধ্য ফাল্গুন)	২.৫০	৭৫	১.৫০	৪৫	২৯০৪০	১১৬১৬
এপ্রিল - মধ্য মে (মধ্য চৈত্র - বৈশাখ)	২.০০	৬০	১.০০	৩০	৫৪৪৫০	২১৭৮০

বি:দ্রঃ এপ্রিল মাসে কেবলমাত্র মধুপুর অঞ্চলের লালমাটিতে, তিস্তা পলি অঞ্চলে গম কাটার পর এবং বীজআখ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য।

রাইউনগান পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন ঃ রাইউনগান বা গাছচারা পদ্ধতিতে চারা উৎপাদনের জন্য প্রথমে ক্ষেতের মধ্যে দন্ডায়মান ইক্ষুর মাথাটি কেটে দিতে হয়। এরপর কয়েকদিন গেলেই আখগাছের উপরে দিকের প্রতিটি চোখ গজায় এবং তা থেকে প্রচুর কুশি উৎপন্ন হয়। এই কুশিগুলিকে আলাদা করে কেটে পরবর্তীতে তা নির্দিষ্ট দূরত্বে রোপণ করতে হয়। রোপণের পরপরই একটি জীবনী সেচ দেয়া দরকার।

বাড্ চিপ পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন ঃ চারা উৎপাদনে বীজ খরচ কমাবার জন্য এটিও একটি সহজ পদ্ধতি। এক্ষেত্রে আখ কাটার পূর্ব মুহূর্তে দন্ডায়মান ইক্ষু থেকে কিংবা মিলে দেয়ার পূর্বে আখ থেকে শুধুমাত্র চোখগুলি কেটে তুলে নিয়ে এসে পূর্বে বর্ণিত নিয়মে পলিথিন ব্যাগের মধ্যে রেখে চারা উৎপাদন করা হয়। এ পদ্ধতিতেও উৎপাদনকৃত চারা মূল জমিতে রোপণের পরপরই জীবনী সেচ প্রদান বাধ্যতামূলক।

স্টকলেস পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন ঃ এক স্থান থেকে অন্যস্থানে ইক্ষুবীজ কিংবা চারা পরিবহন একটি কঠিন কাজ। কারণ এক একর জমির জন্য যে পরিমাণ বীজ দরকার হয় তা বহনের জন্য দরকার হয় দু'টি ট্রাক। অন্যদিকে এক একর জমির জন্য যে পরিমান চারা দরকার হয় তা বহনের জন্য একটি মিনি ট্রাকের দরকার হয়। ইক্ষুচারা পরিবহনের এই সমস্যার কারণেই নতুন উদ্ভাবিত ইক্ষুজাতের দ্রুত বিস্তার সম্ভব হয় না। স্টকলেস পদ্ধতিতে উৎপাদিত চারা ধানের চারার মতই অনায়াসে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে বহন করা যায়। এ পদ্ধতিতে উৎপাদিত এক একর জমির জন্য যে চারা দরকার হয় তা কেবলমাত্র একটি পা-চালিত রিক্সা ভ্যানেই পরিবহন করা যায়।

পূর্বে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী বীজতলায় চারা উৎপাদন করে ঐ চারার কান্ড থেকে গাছটি পৃথক করা হয়। ফলে তা ধানের চারার মতই আঁটি বেঁধে অনায়াসে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে বহন করা যায়। পৃথকীকৃত এ গাছটির সঙ্গে কোন শিকড় থাকে না। সেকারনেই শতকরা একভাগ ন্যাপলিন এসিটিক এসিডের দ্রবণে চারাগুলো সারারাত ডুবিয়ে রেখে পরদিন তা মাঠে রোপণ করতে হয়। এতে চারাগুলি সহজেই মাঠে লেগে যায়।

সার প্রয়োগ

(সার প্রয়োগ বিষয়ক চিত্রাবলী পৃষ্ঠা ১০১-১০৩ দ্রষ্টব্য)

যেকোন ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে পারিপার্শ্বিক অন্যান্য অবস্থার সাথে মাটি ও মাটিতে অবস্থিত বিভিন্ন খাদ্যোপাদান বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সুস্থ ও সবল ভাবে বেড়ে ওঠার জন্য ইক্ষু গাছ সর্বমোট ১৬টি প্রয়োজনীয় খাদ্য-উপাদান গ্রহণ করে। এরমধ্যে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম, সালফার, ম্যাঙ্গানিজ ও দস্তার গুরুত্ব অনেক বেশি হওয়ায় সেগুলির প্রয়োজনীয়তা, অভাবজনিত লক্ষণ এবং পরিমাণ এখানে উল্লেখ করা হলো।

নাইট্রোজেন ঃ

ইক্ষুর একাধিক জৈবযোগ নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত। ইক্ষুর বৃদ্ধি, বিপাক এবং বংশগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্থানান্তরণের অপরিহার্য প্রোটিন, নিউক্লিক এসিড প্রভৃতি পদার্থগুলি তৈরীতে নাইট্রোজেনের গুরুত্ব অপরিসীম।

ইক্ষুর নাইট্রোজেনের অভাবজনিত লক্ষণ পুরাতন/বয়স্ক পাতায় প্রকাশ পায় ঃ

- সার্বিকভাবে পুরো গাছে লক্ষণ দেখা যায়; পুরাতন পাতা অগ্রভাগ থেকে মরতে শুরু করে।
- পাতা সমানভাবে হালকা সবুজ থেকে ক্রমশঃ হলুদ বর্ণ ধারণ করে।
- কান্ড-পর্ব (গিট) ছোট এবং চিকন হতে থাকে; বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
- পুরাতন পাতার অগ্রভাগ ও কিনারায় অকালে পচন শুরু হয়।

ইক্ষুর পাতায় নাইট্রোজেনের পর্যাপ্ততা ঃ

পাতায় নাইট্রোজেনের পরিমাণ	পুষ্টি অবস্থা
১.২০%	কম, সংকটাপন্ন
২.০০-২.৬০%	পর্যাপ্ত, স্বাভাবিক

নাইট্রোজেনের অভাবজনিত লক্ষণ নিরসনে করণীয় ঃ

মাটির পুষ্টিমান ও ফলন লক্ষ্যমাত্রা ভেদে হেক্টরপ্রতি ১৭৫-৩০৫ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।

ফসফরাস ঃ

ফসফরাস উদ্ভিদ দেহে ফসফোলিপিড, নিউক্লিওটাইড, নিউক্লিক এসিড প্রভৃতি গঠনের উপাদান। পরিপক্ক উদ্ভিদে ফল ও বীজে ফসফরাস অধিক মাত্রায় জমা থাকে। ফসফরাসের অভাবে গাছে প্রোটিন তৈরী ব্যাহত হয়, উদ্ভিদের পাতা নীল-বেগুনী বর্ণ ধারণ করে। ফসফরাস ফসফেট হিসাবে উদ্ভিদের এক অঙ্গ থেকে অন্য অঙ্গে স্থানান্তরিত হয়।

ইক্ষুতে ফসফরাসের অভাবজনিত লক্ষণ পুরাতন/বয়স্ক পাতায় প্রকাশ পায় ঃ

- পুরো গাছে লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে; বয়স্ক পাতার অগ্রভাগ মরতে শুরু করে (die-back)।
- পাতা গাঢ় সবুজ থেকে নীলাভ-সবুজ রং ধারণ করে। বিশেষতঃ সরাসরি রৌদ্রপীড়িত পাতার অগ্রভাগ ও কিনারায় লাল/গাঢ় লাল রং দেখা দেয়।
- পাতা স্বাভাবিক আকারের তুলনায় চিকন ও লম্বায় ছোট হয়।
- পুরাতন পাতা প্রথমে হলুদ হয়ে ক্রমশঃ অগ্রভাগ থেকে মরতে শুরু করে।

- কান্ডের বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ায় উহা খাটো এবং চিকন হয়।
- সার্বিকভাবে কুশির সংখ্যা কম হয়।

ইক্ষুর পাতায় ফসফরাসের পর্যাপ্ততা ঃ

পাতায় ফসফরাসের পরিমাণ	পুষ্টি অবস্থা
০.১৯%	অপ্রতুল, সংকটাপন্ন
০.২২-০.৩০%	পর্যাপ্ত, স্বাভাবিক

ফসফরাসের অভাবজনিত লক্ষণ নিরসনে করণীয় ঃ

মাটির পুষ্টিমান ও ফলন লক্ষ্যমাত্রা ভেদে হেক্টরপ্রতি ১৫০-২৩০ কেজি টিএসপি সার প্রয়োগ করতে হবে।

পটাশিয়াম ঃ

উদ্ভিদ বা ফসলের সার্বিক বৃদ্ধিতে পটাশিয়ামের প্রয়োজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভিদের সক্রিয় বাড়ন্ত স্থানে এবং পত্ররন্ধ্রে অধিক পরিমাণে পটাশিয়াম সঞ্চিত থাকে। ইহা একাধিক উৎসেচক/সহ-উৎসেচককে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে সহায়তা করে। গাছের শ্বসন ও আমিষ তৈরীতে পটাশিয়ামের ভূমিকা রয়েছে। উদ্ভিদ কোষকে রসালো অবস্থায় রাখতে পটাশিয়াম অপরিহার্য। নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের মত পটাশিয়াম সহজেই উদ্ভিদ দেহের এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে পারে।

ইক্ষুতে পটাশিয়ামের অভাব জনিত লক্ষণ পুরাতন/বয়স্ক পাতায় প্রকাশ পায় ঃ

- বয়স্ক পাতায় স্থান বিশেষে লক্ষণ সীমাবদ্ধ থাকে যা কোরোসিস (পাতার সবুজ রং নষ্ট হয়ে যাওয়া) সৃষ্টি করে।
- পাতার অগ্রভাগ ও কিনারায় হলুদ-কমলা রঙের ক্লোরোসিস দেখা দেয় এবং এ স্থানের উপশিরার মধ্যবর্তী জায়গায় ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে।
- বয়স্ক পাতা পুরোপুরি বাদামী রং ধারণ করে, যা পোড়া চিহ্নের মত মনে হয়।
- পাতার মধ্যশিরার উপরে লম্বালম্বি লালচে দাগ দেখা যায়।
- অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক পাতা গাঢ় সবুজ রং ধারণ করে।
- পটাশিয়ামের অভাব দীর্ঘস্থায়ী হলে কান্ডের ভাজক-কলার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ফলে "গুচ্ছ আগা" বা পাখার ন্যায় আকৃতি ধারণ করে।

ইক্ষুর পাতায় পটাশিয়ামের পর্যাপ্ততা ঃ

পাতায় পটাশিয়ামের পরিমাণ	পুষ্টি অবস্থা
০.৯০% পর্যন্ত	অপ্রতুল, সংকটাপন্ন
১.০০-১.৬০%	পর্যাপ্ত, স্বাভাবিক

পটাশিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণ নিরসনে করণীয় ঃ

মাটির পুষ্টিমান ও ফলন লক্ষ্যমাত্রা ভেদে হেক্টরপ্রতি ১৬০-২৬০ কেজি এমপি সার প্রয়োগ করতে হবে।

গন্ধক ঃ

গন্ধক উদ্ভিদের সার্বিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। গন্ধকযুক্ত এমাইনো এসিড এবং ভিটামিনসমূহ উদ্ভিদের এনজাইমের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। ইক্ষু পাতার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ, গাছের উচ্চতা এবং কুশি ও মাড়াইযোগ্য আখের পরিমাণ বৃদ্ধিতে গন্ধক বিশেষ ভূমিকা রাখে।

ইক্ষুতে গন্ধকের অভাবজনিত লক্ষণ কচি পাতায় প্রকাশ পায় ঃ

- কচি পাতা হলুদাভ রং ধারণ করে।
- পুরো গাছই হালকা সবুজ রং ধারণ করে এবং কুঁকড়ে যায়।
- পাতা স্বাভাবিক আকারের তুলনায় চিকন ও খর্বাকৃতির হয়।
- ক্রমশঃ পুরো গাছটি সরু হয়ে শুকিয়ে যায়।

ইক্ষুর পাতায় গন্ধকের পরিমাণ ও পুষ্টি অবস্থা ঃ

পাতায় নাইট্রোজেনের পরিমাণ	পুষ্টি অবস্থা
০.১৩% পর্যন্ত	অপ্রতুল, সংকটাপন্ন
০.১৮% পর্যাপ্ত	স্বাভাবিক

গন্ধকের অভাবজনিত লক্ষণ নিরসনে করণীয় ঃ

মাটির পুষ্টিমান ও ফলন লক্ষ্যমাত্রা ভেদে হেক্টরপ্রতি ৮৫-১৬৫ কেজি জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হবে।

ম্যাগনেশিয়াম

ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরোফিল অণুর একটি উপাদান হওয়ায় সবুজ পাতার ক্লোরোফিল তৈরীতে এর প্রয়োজন অপরিহার্য। ম্যাগনেশিয়াম শর্করা বিপাক ও নিউক্লিক এসিড গঠন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত উৎসেচক (এনজাইম)-এর কার্যকারিতাকে সহায়তা করে।

ইক্ষুতে ম্যাগনেশিয়ামের অভাব জনিত লক্ষণ পুরাতন/বয়স্ক পাতায় প্রকাশ পায় ঃ

- ম্যাগনেশিয়ামের অভাবে পাতায় অ্যানথোসায়ানিন রঞ্জক পদার্থের উপস্থিতি এবং পচন চিহ্ন (necrotic spot) প্রকটভাবে দেখা দেয়।
- পাতার অগ্রভাগ ও কিনারা থেকে লালচে পচন চিহ্ন ক্রমশঃ নিম্নগামী হয়ে পুরো পাতায় মরচে পড়া (rusty appearance) ধরণের লক্ষণ দেখা দেয়।
- কান্ডের অভ্যন্তরে বাদামী রং প্রকাশ পেতে পারে।

ইক্ষুর পাতায় ম্যাগনেশিয়ামের পর্যাপ্ততা ঃ

পাতায় ম্যাগনেশিয়ামের পরিমাণ	পুষ্টি অবস্থা
০.১২% পর্যন্ত	অপ্রতুল
০.১৫-০.৩২%	পর্যাপ্ত, স্বাভাবিক মাত্রা

গন্ধকের অভাবজনিত লক্ষণ নিরসনে করণীয় ঃ

মাটির পুষ্টিমান ও ফলন লক্ষ্যমাত্রা ভেদে হেক্টরপ্রতি ১৬-৩৩ কেজি ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড সার প্রয়োগ করতে হবে।

দস্তা ঃ

উদ্ভিদদেহে কয়েক ধরণের প্রোটিন (আরএনএ) তৈরীতে এনজাইম, অক্সিন প্রভৃতি উৎপাদনে, বীজ উৎপাদনে দ্রুত পরিপক্কতায় দস্তা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

ইক্ষুতে দস্তার অভাবজনিত লক্ষণ কচি পাতায় প্রকাশ পায় ঃ

- অঙ্কুরোদ্গম সজীব থাকে তবে কচি পাতায় বিভিন্ন মাত্রার ক্লোরোসিস দেখা দেয় কিন্তু নেতিয়ে পড়ে না।
- পাতার ধার বরাবর মরা দাগ দেখা দেয়; মধ্যশিরার উভয় পার্শ্বেই ক্লোরোটিক টিস্যু দেখা দেয়।
- পাতার আকার ছোট হয় এবং মাঝখানে চওড়া হওয়ায় অসম আকৃতি ধারণ করে।
- পাতার গোড়া থেকে শুকিয়ে আগা পর্যন্ত যায়।
- পর্বমধ্য খাটো হয়।
- কুশি কমে যায়।

ইক্ষুর পাতায় দস্তার পরিমাণ ও পুষ্টি অবস্থা ঃ

পাতায় দস্তার পরিমাণ	পুষ্টি অবস্থা
১০.৯-১১.৮ পিপিএম	অপ্রতুল
১৫.২-২০.৬ পিপিএম	পর্যাপ্ত, স্বাভাবিক

দস্তার অভাবজনিত লক্ষণ নিরসনে করণীয় ঃ

মাটির পুষ্টিমান ও ফলন লক্ষ্যমাত্রা ভেদে হেক্টরপ্রতি ৬-৯ কেজি জিঙ্ক-সালফেট প্রয়োগ করতে হবে।

পুষ্টি উপাদানের জন্য সার সুপারিশ ঃ

ইক্ষু রোপণের জন্য নালা তৈরীর পর নালার মধ্যে ভালভাবে বিভিন্ন রাসায়নিক সার প্রয়োজনীয় মাত্রায় প্রয়োগ করে তা কোদালের সাহায্যে কুপিয়ে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য সুপারিশকৃত সারের মাত্রা এখানে দেয়া হল।

বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের জন্য সুপারিশকৃত সারের মাত্রা

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল	মিল জোন	প্রত্যাশিত ফলন টন/হেঃ	সুপারিশকৃত সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)					
			ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	জিঙ্ক সালফেট
কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১. হিমালয়ের পুরাতন পাদধৌত অঞ্চল (পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও,দিনাজপুর)	পচিক ঠাচিক সেচিক	৮০±৮	২৬০	১৮০	২০০	১৪০	৩৩	৬
কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ৩. তিস্তা মিস্তার ফ্যানপ্লেন (রংপুর, বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ, রাজশাহী	রচিক শ্যাচিক জচিক	৮০±৮	২৬০	২০৫	১৫০	১১০	২৫	৬
কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ৮. ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা বিধৌত সমভূমি (শেরপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, ঢাকা গাজীপুর)	জিবাচিক	৮০±৮	২৬০	২০৫	১৪০	১৪০	-	৬
কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ৯. পুরাতন ব্রহ্মপুত্র বিধৌত সমভূমি (শেরপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ	কাচিক	৬০±৬	২১৭	১২৫	১১০	৮৫	-	৬
কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১১. গঙ্গাবাহিত উচ্চ সমভূমি অঞ্চল (নবাবগঞ্জ, রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, মাগুড়া, সাতক্ষীরা)	রাচিক নাচিক উবচিক পাচিক কেরু মোচিক	৮০±৮	২৮০	১৮০	১২০	১১০	-	৯
কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১২. গঙ্গাবাহিত নিম্ন সমভূমি অঞ্চল (নাটোর, পাবনা, গোয়ালন্দ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ)	নাচিক পাচিক ফচিক	৬০±৬	১৭৫	১৫০	৮০	১১০	-	৯
কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ২৫. সমতল বরেন্দ্র ভূমি (দিনাজপুর, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, বগুড়া, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ)	শ্যাচিক জচিক	৮০±৮	৩০৫	২৩০	২৬০	১৬৫	৩৩	৬

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল	[illegible]	প্রত্যাশিত ফলন (টন/হেঃ)	সুপারিশকৃত সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)					
			ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	জিঙ্ক সালফেট
কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ২৬, উচ্চ বরেন্দ্র ভূমি (রাজশাহী নবাবগঞ্জ, নওগাঁ)	[illegible]	৮০±৮	৩০৫	২৩০	২৬০	১৬৫	৩৩	৬
কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ২৭, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বরেন্দ্র ভূমি (দিনাজপুর, জয়পুরহাট, রংপুর, গাইবান্ধা জেলা)	[illegible]	৮০±৮	৩০৫	২৩০	২০০	১৪০	৩৩	৬
কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ২৮, মধুপুর অঞ্চল (ঢাকা, গাজীপুর, নরসিংদী, টাঙ্গাইল, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ)	-	৮০±৮	২৬০	২০৫	২০০	১৬৫	১৬	৬
কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ২৯, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ী এলাকা (খাগড়াছড়ি, পার্বত্য চট্টগ্রাম)	-	৬০±৬	১৭৫	১৫০	১৮০	১১০	১৬	৬
কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ৩০, আখাউড়া উপত্যকা (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, হবিগঞ্জ)	-	৮০±৮	১৯৫	১৫০	১৬০	১১০	১৬	৬

উৎসঃ সার সুপারিশ গাইড - ১৯৯৭, বি এ আর সি, ঢাকা

ইউরিয়া ও পটাশ সারের অর্ধেক এবং ফসফেট, জিপসাম ও জিঙ্ক সালফেট সারের সম্পূর্ণ অংশ বীজখন্ড লাগানোর সময় প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে সারগুলোকে একত্রে মিশানো যেতে পারে তবে মিশানোর পর পরই তা দ্রুত জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ২/৩ অংশ ইউরিয়া ও এমপি সার সমান দু ভাগে ভাগ করে দু কিস্তিতে কুশি বের হওয়াকালীন সময়ে একবার ও কুশি হওয়া শেষ হলে একবার প্রয়োগ করতে হবে।

সাথীফসল চাষ

(সাথীফসল বিষয়ক চিত্রাবলী পৃষ্ঠা ৮৯-৯২ দ্রষ্টব্য)

যেহেতু ইক্ষু একটি দীর্ঘমেয়াদী ফসল তাই ইক্ষুর সঙ্গে অন্ততঃ একটি সাথীফসল অবশ্যই করা উচিত। সাথীফসল চাষের মাধ্যমে একজন ইক্ষুচাষী বিভিন্নভাবে লাভবান হতে পারে।

- ইক্ষু চাষ করেও একই জমি থেকে চাষী তার রবি ফসল ও সব্জির চাহিদা মেটাতে পারে।
- একই পরিমাণ জমি থেকে অধিক পরিমাণ ফসল উৎপাদন করা যায়।
- একই পরিমাণ জমি থেকে অধিক পরিমাণ লাভ করা যায়।
- ইক্ষুচাষীর জন্য আয় ও নিরাপত্তা বাড়ে।

- বহুমুখী ফসল আবাদ করা যায়।
- আখ কর্তনের পূর্বে অন্তর্বর্তী সময়ে চাষীর জন্য অর্থের সংস্থান হয়।
- আগাছা দমনে সহায়তা করে।
- কোন কোন সাথীফসল মূল ফসল আখের ফলন বৃদ্ধি করে।

তবে যত্নবান না হলে সাথীফসল চাষের জন্য ক্ষতিও হতে পারে। তাই সাথী ফসলের অসুবিধাসমূহও আমাদের জানা দরকার।

- উপযুক্ত পরিচর্যার অভাবে রোগ ও পোকার উপদ্রব বেড়ে যেতে পারে। এর ফলে আখ ও সাথীফসল উভয়েরই ফলন কমে যেতে পারে।
- বেশি টাকা বিনিয়োগ করতে হয়।
- অতিরিক্ত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন হয়।

সাথীফসল হিসেবে ফসল নির্বাচনের জন্য বিবেচ্য বিষয় ঃ

- সাথীফসল যেন ইক্ষুর প্রতিযোগী না হয়।
- সাথীফসল অবশ্যই দ্রুত বর্ধিষ্ণু হতে হবে।
- সাধারণভাবে শাখা-প্রশাখাবিহীন হতে হবে।
- সাধারণভাবে অগভীর মূলের ফসল হতে হবে।
- চার মাসের বেশি জীবন-চক্র হবে না।
- সাধারণভাবে ইক্ষুর 'উপকারী ফসল' (ডালজাতীয় ফসল এবং আলু) নির্বাচন করতে হবে।

ইক্ষুর সাথে সাথীফসলের আয়-ব্যয়ের হিসাব

সাথীফসল প্যাকেজ	ফলন (টন/হেঃ)	বাজার দর (টাকা/টন)	মোট উৎপাদন খরচ (টাকা/হেঃ)	মোট আয় (টাকা/হেঃ)	লাভ (টাকা/হেঃ)
ইক্ষু (একক)	৯৮.১১	১০০০	৫৫০০০	১০৭৮০৩	৫২৮০৩
ইক্ষু + আলু	১২	৫,০০০	৭৯৪২৮	১৬৪৩৮৬	৮৪৯৫৮
ইক্ষু + সরিষা	০.৮	১৪,০৬২৫.৫	৬০২৬৬	১১৫৬৩৬	৫৫৩৭০
ইক্ষু + মসুর	০.৬	২৫,০০০	৬১৩৩৮	১১৯৩৮৬	৫৮০৪৮
ইক্ষু + বাঁধাকপি	৪০	২,০০০	৭৮৪৩৫.৫	১৮৪৩৮৬	১০৫৯৫০.৫
ইক্ষু + ফুলকপি	১৫	৪,০০০	৭৮৮৭৫.৫	১৬৪৩৮৬	৮৫৫১০.৫
ইক্ষু + বুশবিন	১০	৫,০০০	৬৪৪৪৩	১৫৪৩৮৬	৮৯৯৪৩
ইক্ষু + ব্রকলি	৮	৫,০০০	৭৭৩৭৮	১৪৪৩৮৬	৬৭০০৮
ইক্ষু + গাজর	১২	৫,০০০	৬৮০৩৩	১৬৪৩৮৬	৯৬৩৫৩
ইক্ষু + ছোলা	৪	৮,০০০	৬২৬৩৮	১৩৬৩৮৬	৭৩৭৪৮
ইক্ষু + বেবিকর্ণ	৭৮২১৪ টি		৬৭৩৪৩	১৮২৬০০	১১৫২৫৭
ইক্ষু + কালোজিরা	০.৪	৫০,০০০	৬০১৯৩	১২৪৩৮৬	৬৪১৯৩
ইক্ষু + মেথী	০.৭৫	৪০,০০০	৬০৮৭৩	১৩৪৩৮৬	৭৩৫১৩

সাথীফসল প্যাকেজ	ফলন (টন/হেঃ)	বাজার দর (টাকা/টন)	মোট উৎপাদন খরচ (টাকা/হেঃ)	মোট আয় (টাকা/হেঃ)	লাভ (টাকা/হেঃ)
ইক্ষু + মৌরী	০.৫	৬০,০০০	৬০৬৬৮	১৩৪৩৮৬	৭৩৭১৮
ইক্ষু + রাঁধুনী	০.৫	৫০,০০০	৬০৯২৩	১২৯৩৮৬	৬৮৪৬৩
ইক্ষু + সেলুক	০.৭৫	২৫,০০০	৬০৭২৩	১২৩১৩৬	৬২৪১৩
ইক্ষু + ফিরিঙ্গি	০.৭৫	৫০,০০০	৬০৮২৩	১৪১৮৮৬	৮১০৬৩
ইক্ষু + পিঁয়াজ	৬	১০,০০০	৭৫৮৪৮	১৬৪৩৮৬	৮৮৫৩৮
ইক্ষু + রসুন	৩	১৮,০০০	৭৫৪৩৫.৫	১৫৮৩৮৬	৮২৯৫০.৫
ইক্ষু + ধনিয়া	১	২০,০০০	৬১৪১০.৫	১২৪৩৮৬	৬২৯৭৫.৫
ইক্ষু + আলু-মুগ		২৫,০০০	৮৬৫৮৮	১৭৬৮৮৬	৯০২৯৮
ইক্ষু + পিয়াজ-মুগ			৮২৫৯৫.৫	১৭০৮৮৬	৮৮২৯০.৫
ইক্ষু + সরিষা-মুগ			৬৭৪২৬	১২৮১৩৬	৫৯৪৬০
ইক্ষু + মসুর-মুগ			৬৮৪৯৮	১৩১৮৮৬	৬৩৩৮৮
ইক্ষু +বাঁধাকপি-মুগ			৮৫৫৯৫.৫	১৯৬৮৮৬	১১১২৯০.৫
ইক্ষু+ফুলকপি-মুগ			৮৬০৩৫.৫	১৭৬৮৮৬	৯০৮৫০.৫

সাথী ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় সারের মাত্রা ঃ

দেশের ৩০টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের মধ্যে মাত্র ৯টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে সাথী ফসলের চাষ হয়। এসব কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের জন্য ইক্ষু ও সাথীফসলের সারের মাত্রা এখানে দেয়া হল।

ফসল	ফলন লক্ষ্যমাত্রা (টন/হেঃ)	সার সুপারিশ (কেজি/হেঃ)					
		ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড	জিঙ্ক সালফেট
ইক্ষু	৬০±৬ - ৮০±৮	১৭৪-৩০৪	১৪৩-২১৫	৮০-২৬০	৮৩-১৬৬	১৭-৩৩	৬-৮
আলু	১০±১ - ১২±১	৮৭-১০৮	৩৮-৪৮	৪০-৮০	১৭-৫৬	---	---
পিঁয়াজ/ রসুন	৮±১	১০৮	৯৫-১১৯	৬০-১২০	৫৬-১১১	---	---
ডাল ফসল	০.৫±০.১ - ০.৬ ±০.১	১১-১৫	২৪-৩৩	১০	---	---	---
ছোলা	০.৬±০.১	১৭-২২	৪৮	২০-৪০	৩৩-৫৬	---	---
সরিষা	০.৫±০.১ - ০.৬±০.১	৭৬-৮৭	৪৮	৩০-৫০	৫৬	---	---
হলুদ	১.৫±০.২	১০৮	৭২	৮০	৫৭	---	---

ইক্ষুর ক্ষতিকর পোকা দমন ব্যবস্থাপনা

(পোকা দমন বিষয়ক চিত্রাবলী পৃষ্ঠা ৯৫-১০০ দ্রষ্টব্য)

কথায় বলে 'বোকার ফসল পোকায় খায়'। পোকামাকড়ের উপদ্রব থেকে ইক্ষু ফসলকে রক্ষা করার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া না হলে সম্পূর্ণ ফসলই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এতে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন ইক্ষুচাষীগণ। তাই ক্ষতিকর পোকা দমনের জন্য প্রয়োজন ইক্ষুচাষীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। একক প্রচেষ্টায় কোন একটি ক্ষেত থেকে পোকা দমন করা হলেও যদি আশেপাশের ক্ষেতগুলি পোকামুক্ত না থাকে তাহলে সেখান থেকে ক্ষতিকর পোকা মাকড়সমূহ পুনরায় ঐ পোকামুক্ত ক্ষেতে আক্রমণ করতে পারে। নিম্নে বর্ণিত চারটি পদ্ধতিতে ক্ষতিকর পোকা দমন করা যেতে পারে ঃ

১) কৃষিতাত্ত্বিক পদ্ধতি
২) যান্ত্রিক পদ্ধতি
৩) জৈবিক পদ্ধতি
৪) রাসায়নিক পদ্ধতি

এখানে ইক্ষুর প্রধান প্রধান ক্ষতিকর পোকাসমূহের বর্ণনা, আক্রমণের লক্ষণ ও বিভিন্ন উপায়ে দমন ব্যবস্থাপনা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

ডগার মাজরা পোকা (*Scirpophaga excerptalis* Walker)

ক) পোকার বর্ণনা ঃ

ডগার মাজরা পোকার মথ মাঝারি আকারের এবং দেখতে সাদা রং এর। এদের সামনের পাখায় কখনও কখনও একটি করে কালো ফোটা থাকে। স্ত্রী মথ পাতার নীচে গাদা করে ডিম পাড়ে। ডিমগুলো কটা রং এর লোম দ্বারা ঢাকা থাকে। কীড়াগুলো দেখতে হলুদাভ সাদা, গায়ে কোন ডোরা নেই; সম্মুখ দিকটা সরু, পেছনের দিকটা ক্রমশঃ মোটা।

খ) আক্রমণের লক্ষণ ঃ

১) কীড়া প্রবেশ করার কারণে পাতার মধ্য শিরার পাশ বরাবর সুতার মত লম্বালম্বি দাগ দেখা যায়। পাতায় প্রায় সমান্তরালভাবে ছোট ছোট ছিদ্র চোখে পড়ে এবং এক পাশ পোড়া পোড়া ও কোঁকড়ানো দেখা যায়।
২) ইক্ষুর মাইজ মরে যায়।
৩) বয়স্ক গাছে আক্রমণ হলে প্রায়শঃই পার্শ্বশাখা গজায়।

গ) দমন ব্যবস্থাপনা ঃ

১) কৃষিতাত্ত্বিক পদ্ধতি ঃ

- পোকামুক্ত বীজ নির্বাচন।
- পোকা সহনশীল জাতের চাষাবাদ করা

- আগাম চাষ (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর) ও আগাম কর্তন (অক্টোবর-জানুয়ারী) করা।
- অধিক আক্রান্ত পুরনো জমি থেকে নিরাপদ দূরত্বে নতুন ইক্ষু রোপণ।
- নিয়মিত আগাছা দমন।
- সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগ (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল অনুযায়ী)।
- অতিরিক্ত পানি সেচ দেওয়া থেকে বিরত থাকা।

২) যান্ত্রিক পদ্ধতি ঃ

- মথ সংগ্রহ করে মেরে ফেলা (জানুয়ারী-জুন)।
- ডিমের গাদা সংগ্রহ করে ধ্বংস করা (জানুয়ারী-জুন)।
- আক্রান্ত গাছ পোকাসহ কেটে ধ্বংস করা (জানুয়ারী-জুন)।

৩) জৈবিক পদ্ধতি ঃ

- সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বাঁশের তৈরী পরজীবি আধার (Parasite booster) ব্যবহার করা (জানুয়ারী-জুন)।

৪) রাসায়নিক পদ্ধতি ঃ

অনুমোদিত কীটনাশকের নাম	প্রয়োগমাত্রা	প্রয়োগ পদ্ধতি
ফুরাডান ৫জি/ কুরাটার ৫জি/ ফুরাটাফ ৫জি/ ফুরাফুরান ৫জি/সানফুরান ৫জি/ব্রিফার ৫জি/ ফেন্ডোর ৫জি/ফুরাসান ৫জি।	৪০.০ কেজি/হেঃ	আখের সারির দু'পাশে নালা কেটে নালায় এবং দু'নালার মধ্যবর্তী স্থানে গাছের গোড়ায় ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। অতঃপর মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। মাটিতে রস না থাকলে সেচ দিতে হবে। মার্চ ও মে মাসে (২য় ও ৩য় প্রজন্মে) প্রয়োগ করতে হবে।
অথবা ফুরাকার্ব ৩জি	৬৬.০ কেজি/হেঃ	উপরের নিয়মে ২ বার প্রয়োগ করতে হবে।
অথবা মার্শাল ৬জি	৩৩.০ কেজি/হেঃ	উপরের নিয়মে ২ বার প্রয়োগ করতে হবে।

আগাম মাজরা পোকা (*Chilo infuscatellus* Snellen)

ক) পোকার বর্ণনা ঃ

আগাম মাজরা পোকার মথ মাঝারি আকারের এবং হালকা বাদামী রং এর। এদের সামনের পাখা জোড়া হালকা থেকে গাঢ় বাদামী রং এর এবং পাখা দুটোর শেষ প্রান্তে ধার দিয়ে গোল গোল কাল ফোটা আছে। পেছনের পাখা দুটো সাদা রং এর। স্ত্রী মথ পাতার নীচে গাদা করে সারিতে ডিম পাড়ে। আগাম মাজরা পোকার কীড়া গুলো দেখতে ধূসর সাদাটে, পিঠে পাঁচটি লম্বালম্বি হালকা বেগুনী রং এর ডোরা দাগ আছে, মাথার রং গাঢ় বাদামী থেকে কালচে বাদামী।

খ) আক্রমণের লক্ষণ ঃ

১) আখের মাইজ মরে যায় যা টানলে সহজেই উঠে আসে এবং দূর্গন্ধ পাওয়া যায়।

২) গাছের গোড়ায় কীড়া ঢোকার ছিদ্র চিহ্ন এবং বিষ্ঠা দেখা যায়।

গ) দমন ব্যবস্থাপনা ঃ

১) কৃষিতাত্ত্বিক পদ্ধতি ঃ

- সহনশীল জাতের ইক্ষু চাষ করা।
- আগাম চাষ অনুসরণ করা (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর)।
- জমি আগাছা মুক্ত রাখা।
- গাছের গোড়ায় হালকাভাবে মাটি দেয়া (২/৩ বার)।
- গমের জমির পাশে কিংবা সাথী ফসল হিসেবে গমের চাষ পরিহার করা।

২) যান্ত্রিক পদ্ধতি ঃ

- আক্রান্ত গাছ মাটির নীচ থেকে ভিতরের পোকাসহ তুলে ধ্বংস করা (ডিসেম্বর-এপ্রিল)।

৩) রাসায়নিক পদ্ধতি ঃ

অনুমোদিত কীটনাশকের নাম	প্রয়োগমাত্রা	প্রয়োগ পদ্ধতি
ফুরাডান ৫জি/ কুরাটার ৫জি/ ফুরাটাফ ৫জি/ ফুরাসান ৫জি/ এগ্রিফুরান ৫জি/ ফেনডোর ৫জি/ ব্রিফার ৫জি/ ফরাফুরান ৫জি/ রাজফুরান ৫জি	৪০.০ কেজি/হেঃ	রোপণের সময় নালায় অথবা পোকার ২য় প্রজন্মে (সাধারণতঃ ফেব্রুয়ারীতে) আখের সারির দু'পাশে ৩ ইঞ্চি (৮ সেমি.) গভীর নালা করে নালায় ও গাছের গোড়ায় ছিটিয়ে প্রয়োগ করে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। মাটি ভেজা না থাকলে সেচ দিতে হবে।
অথবা মার্শাল ৬জি/ রিজেন্ট ৩জি আর	৩৩.০ কেজি/হেঃ	উপরের নিয়মে প্রয়োগ করতে হবে।
অথবা লরসবান ১৫জি	১৫.০ কেজি/হেঃ	উপরের নিয়মে প্রয়োগ করতে হবে।
অথবা রিজেন্ট ৫০ এসসি	২.০ লিঃ/হেঃ	সেট রোপণের সময় পানিতে মিশিয়ে সিঞ্চন যন্ত্র বা ঝাঁঝরির সাহায্যে ট্রেঞ্চে প্রয়োগ করতে হবে।

পিংগল মাজরা পোকা (*Sesamia inferens* Walker)

ক) **পোকার বর্ণনা ঃ**

এদের মথ দেখতে খড় রং এর, পেছনের পাখা দুটো সাদা। পিংগল মাজরা পোকার মথ অপেক্ষাকৃত সতেজ ও সবল। স্ত্রী মথ পাতার নীচে ২-৩ সারিতে ডিম পাড়ে। এদের কীড়া হালকা গোলাপী (Pink) রং এর এবং অপেক্ষাকৃত বড়, শক্ত ও চঞ্চল। কীড়ার গায়ে কোন ডোরা বা দাগ নেই।

খ) **আক্রমণের লক্ষণ ঃ**

১) আখের ম'ইজ মরে যায় যা টানলে সহজে উঠে আসে এবং দুর্গন্ধ পাওয়া যায়।

২) গাছের গোড়ায় (গায়ে) কীড়া প্রবেশের ছিদ্র চিহ্ন এবং প্রচুর বিষ্ঠা ও গাছের গুড়া লেগে থাকে।

গ) **দমন ব্যবস্থাপনা ঃ**

১) কৃষিতাত্ত্বিক পদ্ধতি ঃ

- জমি আগাছা মুক্ত রাখা।
- আক্রমণ রোধে আখের সাথে গম চাষ পরিহার করা।

২) যান্ত্রিক পদ্ধতি ঃ

- আক্রমণ দেখা যাওয়া মাত্র (ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল) আক্রান্ত গাছ কীড়াসহ
- কেটে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

৩) রাসায়নিক পদ্ধতি ঃ

- সাধারণতঃ ডগার মাজরা ও আগাম মাজরা দমনের জন্য যে সমস্ত কীটনাশক সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলো পিংগল মাজরা পোকা দমনেও কার্যকরী।

গোড়ার মাজরা পোকা (*Emmalocera depressella* Swinhoe)

ক) **পোকার বর্ণনা ঃ**

গোড়ার মাজরা পোকার মথ মাঝারী আকারের খড় রং এর। সামনের পাখা দুটোর শেষ প্রান্ত কিছুটা গোলাকার ও সূক্ষ্ম লোম আছে। পেছনের পাখা দুটো সাদা। এদের স্ত্রীমথ গাছের গোড়ায়, মাটির উপরে অথবা মাটির কাছাকাছি পাতার খোলে বা পাতায় একটি করে অনেকগুলো ডিম পাড়ে। গোড়ার মাজরা পোকার কীড়া হলদে সাদা রং এর এবং মাথার দিকটা মোটা। কীড়ার গায়ের ভাঁজ স্পষ্ট।

খ) **আক্রমণের লক্ষণ ঃ**

১) প্রাথমিকভাবে গাছের ৩য়-৪র্থ পাতা উপর দিক থেকে শুকোতে থাকে।
২) মাইজ পাতা মরে যায় যা টানলে সহজে উঠে আসে না।
৩) পরবর্তীকালে আক্রান্ত গাছের সব পাতাগুলো ক্রমশঃ হলুদ হয়ে শুকিয়ে যায়।
৪) বয়স্ক গাছের বাহিরের পাতাগুলো আগে উপরের দিক থেকে হলদে বাদামী রং ধারণ করে।

গ) **দমন ব্যবস্থাপনা ঃ**

১) **কৃষিতাত্ত্বিক পদ্ধতি ঃ**

- গভীর চাষ অনুসরণ করা।
- সহনশীল জাতের আখ চাষ করা এবং সংবেদনশীল জাত পরিহার করা।
- সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সেচ দিয়ে পানি কয়েকদিন ধরে রাখা (ফেব্রুয়ারী-মে)।
- অধিক আক্রান্ত এলাকায় মুড়ি ইক্ষু চাষ বন্ধ রাখা।
- ফসল চক্র অনুসরণ করা।
- পুরনো শুকনো পাতাগুলো গাছ থেকে ছড়িয়ে ফেলা (আগষ্ট-অক্টোবর)।
- আগাম কর্তন অনুসরণ করা (অক্টোবর-জানুয়ারী)।

২) **যান্ত্রিক পদ্ধতি ঃ**

- আক্রান্ত গাছ মাটির নীচ থেকে পোকাসহ তুলে ধ্বংস করা (জানুয়ারী-জুন)।
- কর্তনের পর মোথাগুলো চাষ দিয়ে বা কোদাল দিয়ে তুলে তা থেকে মথ বের হওয়ার পূর্বেই পুড়িয়ে ধ্বংস করা।

৩) **রাসায়নিক পদ্ধতি ঃ**

অনুমোদিত কীটনাশকের নাম	প্রয়োগমাত্রা	প্রয়োগ পদ্ধতি
লরসবান ১৫জি	১৫.০ কেজি/হেঃ	জমির জো অবস্থায় গাছের গোড়ার কাছে ছিটিয়ে প্রয়োগ করার পর মালচিং কোদাল দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। জো অবস্থা না থাকলে প্রয়োগের ১/২ দিন পূর্বে প্লটে সেচ দিয়ে নিতে হবে। মার্চ, মে ও জুলাই মাসে (মোট ৩ বার) পোকার প্রাদুর্ভাবের উপর নির্ভর করে প্রয়োগ করতে হবে।

কান্ডের মাজরা পোকা (*Chilo tumidicostalis* Hampson)

ক) পোকার বর্ণনা ঃ

কান্ডের মাজরা পোকার সামনের পাখা দুটো ধূসর রং এর এবং শেষ প্রান্তে ৭টি ফোটা আছে। পাখার মাঝখানের অংশ কালচে আঁশযুক্ত। এদের স্ত্রী মথ পাতার নীচে সারি করে ডিম পাড়ে, ডিমগুলো অনেক সময় একটার গায়ে আরেকটা লেগে থাকে। প্রাথমিক অবস্থায় এদের কীড়াগুলো দেখতে গাঢ় বাদামী রং এর। কান্ডের মাজরা পোকার কীড়ার পিঠে পিংগল রং এর সারিবদ্ধ ফোঁটা রয়েছে যেগুলো চারটি দাগের মত দেখায়।

খ) আক্রমণের লক্ষণ ঃ

১) প্রাথমিক অবস্থায় গাছের পাতাগুলো শুকাতে থাকে এবং পরিণতিতে ইক্ষুর মাথা বা উপরিভাগ মরে যায়। কখনো কখনো আক্রান্ত গাছের মাথা সহজেই ভেঙ্গে যায়।

২) দ্বিতীয় পর্যায়ের আক্রমণে কান্ডের গায়ে অনেক গুলো ছিদ্র থাকে এবং ছিদ্রের গায়ে কীড়ার বিষ্ঠাসহ গাছের গুড়া লেগে থাকতে দেখা যায়। আক্রান্ত গাছে কখনও কখনও শিকড় গজায় এবং ইক্ষুর কান্ড জড়িয়ে ফেলে এবং অনেক ক্ষেত্রে চোখ গজিয়ে যায়।

গ) দমন ব্যবস্থাপনা ঃ

১) কৃষিতাত্ত্বিক পদ্ধতি ঃ

- পোকা প্রতিরোধী/সহনশীল ইক্ষুজাতের চাষ করা। সংবেদনশীল জাত পরিহার করা।
- প্রত্যায়িত বীজ ক্ষেতের ইক্ষু ব্যবহার করা।
- পোকামুক্ত বীজখন্ড রোপণ করা।
- পুরনো শুকনো পাতাগুলো গাছ থেকে ছড়িয়ে ফেলা (আগষ্ট-অক্টোবর)। আগাম কর্তন অনুসরণ করা (অক্টোবর-জানুয়ারী)

২) যান্ত্রিক পদ্ধতি ঃ

- প্রাথমিক আক্রান্ত গাছ পোকাসহ কেটে ধ্বংস করা (মে-জুলাই)।

৩) জৈবিক (সম্ভাব্য ক্ষেত্রে) পদ্ধতি ঃ

পরজীবির নাম	পরিমাণ/হার	প্রয়োগ পদ্ধতি
ট্রাইকোগ্রামা (ডিম্ব পরজীবি)	৫০,০০০/ হেঃ /সপ্তাহ	মে মাসের ১ম সপ্তাহ থেকে সেপ্টেম্বর মাসের ৪র্থ সপ্তাহ পর্যন্ত সদ্যপ্রসূত (Freshly emerged) ট্রাইকোগ্রামা আখক্ষেতে ছাড়তে হবে। ক্ষেতের যেকোন এক কোণায় ১ মিটার ভিতরে প্রবেশ করে টেষ্টটিউবের মুখ খুলে চতুষ্কোণ হিসাবে হেঁটে হেঁটে ক্রমশঃ জমির মাঝখানে ছাড়া শেষ করতে হবে। অথবা সুবিধামত এমনভাবে ছাড়তে হবে যেন তা সমস্ত প্লটে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

৪) রাসায়নিক পদ্ধতি ঃ

অনুমোদিত কীটনাশকের নাম	প্রয়োগমাত্রা	প্রয়োগ পদ্ধতি
পাদান ৪জি	৭৫.০ কেজি/হেঃ	আখের সারির উভয় পার্শ্বে অগভীর নালা কেটে নালায় কীটনাশক ছিটিয়ে প্রয়োগ করার পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ইপ্সিত দমনের জন্য একই হারে একই নিয়মে ৩ বার (জুন, জুলাই ও আগষ্ট মাসে) প্রয়োগ করতে হবে।

হোয়াইটগ্রাবস্ (Whitegrubs) বা সাদাকীড়া

ক) পোকার বর্ণনা ঃ

এ পর্যন্ত বাংলাদেশে ১৭ প্রজাতির হোয়াইটগ্রাব পাওয়া গেছে। এদের পূর্ণাঙ্গ পোকাকে বিটল (Beetle) বলে, বিটল গুলো দেখতে হলুদ, গাঢ় বাদামী এবং কালো রং এর হয়। স্ত্রী বিটল আখের গোড়ায় মাটির নীচে একটি করে অনেক গুলো ডিম পাড়ে। এদের কীড়া গুলো ধূসর সাদা এবং দেখতে ইংরেজি অক্ষর (C) এর মত। কীড়ার বুকে ৬টি পা আছে, মাথা লাল এবং শক্ত চোয়াল আছে।

খ) আক্রমণের লক্ষণ ঃ

১) কীড়াগুলো আখের শিকড় খায় ফলে গাছ দূর্বল ও রোগা হয়।
২) পুষ্টিহীনতার জন্য গাছের পাতা ক্রমশঃ হলুদ হয়ে যায়।
৩) আক্রান্ত ঝাড়গুলোর বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ায় গাছগুলো বিভিন্ন উচ্চতা বিশিষ্ট হয়।
৪) হোয়াইটগ্রাবস্ আক্রান্ত ঝাড় সামান্য জোরে টান দিলেই উঠে আসে এবং কীড়াগুলো নজরে পড়ে।

গ) দমন ব্যবস্থাপনা ঃ

১) কৃষিতাত্ত্বিক পদ্ধতি ঃ

- রোপণের পূর্বে বার বার গভীর চাষ দিয়ে জমি ২/৩ দিন ফেলে রাখা এবং গভীর ট্রেঞ্চ করা।
- আগাম চাষ অনুসরণ করা (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর)।
- সেচ দিয়ে/বৃষ্টির পানি জমিয়ে আক্রান্ত ক্ষেত ৫-৭ দিন ডুবিয়ে রাখা।
- ফসল চক্র অনুসরণ করা।
- অধিক আক্রান্ত ক্ষেতে মুড়ি আখ চাষ স্থগিত রাখা।

২) যান্ত্রিক পদ্ধতি ঃ

- আম, জাম, পেয়ারা, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছ থেকে এদের পূর্ণাঙ্গ বিটলগুলো হাতজালের/আলোর ফাঁদের সাহায্যে সংগ্রহ করে মেরে মাটিতে পুঁতে ফেলা (ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল)।

৩) রাসায়নিক পদ্ধতি ঃ

অনুমোদিত কীটনাশকের নাম	প্রয়োগমাত্রা	প্রয়োগ পদ্ধতি
ফুরাডান ৫জি/কুরাটার ৫জি/ ফুরাটাফ৫জি/ ফেন্ডোর ৫জি/ ফুরাসান ৫জি /সানফুরান ৫জি/ ভিটাফুরান ৫জি /এগ্রিফুরান ৫জি/ রাজফুরান ৫জি/ ব্রিফার ৫জি/ আরোধান ৫জি/ লিমিকার্ব ৫জি/ কেমফুরান ৫জি/ পিলারফুরান ৫জি/ ফরাফুরান ৫জি	৪০.০ কেজি/হেঃ	আখের সারির উভয় পার্শ্বে নালা কেটে ও গাছের গোড়ায় দানাগুলো ছিটিয়ে দেওয়ার পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। মাটি ভেজা না থাকলে সেচের ব্যবস্থা নিতে হবে। দুই বার প্রয়োগ করতে হবে। ১ম বার মার্চ মাসের মাঝামাঝি এবং ২য় বার এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি।
মার্শাল ৬জি	৩০.০ কেজি/হেঃ	উপরের নিয়মে ২ বার প্রয়োগ করতে হবে।
অথবা মিরাল ৩জি/ ফুরাকার্ব ৩জি/ফুরাডান ৩জি/কুরাটার ৩জি/কার্বোফুরান ৩জি	৬৬.০ কেজি/হেঃ	উপরের নিয়মে ২ বার প্রয়োগ করতে হবে।
অথবা লরসবান ১৫জি	১৫.০ কেজি/হেঃ	উপরের নিয়মে ২ বার প্রয়োগ করতে হবে।

উঁই পোকা (*Termites*)

ক) পোকার বর্ণনা ঃ

এ পর্যন্ত বাংলাদেশে ইক্ষুর জমিতে ৫ প্রজাতির উঁই পোকা পাওয়া গেছে। উঁই পোকার মাথা ও বুক গাঢ় বাদামী রঙের এবং পেট সাদাটে-হলদে রঙের। এরা সমাজবদ্ধ প্রাণী। উঁই এর রাণী সাধারণতঃ মাটির তৈরী কুঠুরিতে ডিম পাড়ে। এদের বাচ্চা দেখতে পূর্ণবয়স্ক উঁই এর মতই।

খ) আক্রমণের লক্ষণ ঃ

১) রোপণকৃত বীজখন্ডের চোখ এমনকি বীজখন্ডের ভিতরের অংশ খেয়ে ফেলার দরুন গাছ গজাতে পারে না, ফলে মাঠে গাছের সংখ্যা কমে যায় এবং পরিণামে জমি ফাঁকা ফাঁকা (Gappy germination) হয়।

২) আক্রান্ত কচি গাছ শুকিয়ে মারা যায়।

৩) ইক্ষু দাঁড়ানো অবস্থায়ও এরা আখের মূল শিকড় ও কান্ড খেয়ে ক্ষতি সাধন করে। দাঁড়ানো ইক্ষুতে মাঝে মধ্যে উঁই পোকার মাটির টানেল বা সুড়ঙ্গ পথ দেখা যায়।

গ) **দমন ব্যবস্থাপনা ঃ**

১) **কৃষিতাত্ত্বিক পদ্ধতি ঃ**

- সেট রোপণের জন্য গভীর চাষ/গভীর নালা করা।
- আঁকাবাঁকা (Zigzag) পদ্ধতিতে সেট রোপণ করা।
- রোপা পদ্ধতিতে ইক্ষুচাষ করা।
- সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সেচ দিয়ে কয়েকদিন জমিতে পানি ধরে রাখা।
- মুড়ি আখ চাষ স্থগিত করা।
- ফসল চক্র অনুসরণ করা।

২) **যান্ত্রিক পদ্ধতি ঃ**

- প্রাথমিক আক্রান্ত গাছগুলি সেটসহ তুলে ধ্বংস করা।
- ঢিবিসহ উঁই পোকা ধ্বংস করা এবং রাণী উঁই সংগ্রহ করে মেরে ফেলা।

৩) **খাদ্য ফাঁদের সাহায্যে ঃ**

- খাদ্য ফাঁদ ব্যবহার করা যেমন-মাটির হাড়িতে পাট কাঠি, ধৈঞ্চা ইত্যাদি ভরে জমিতে পুতে রেখে কিছু দিন পর পর উক্ত হাড়ি তুলে সংগৃহীত উঁই পোকা মেরে ফেলা।

৪) **রাসায়নিক পদ্ধতি ঃ**

অনুমোদিত কীটনাশকের নাম	প্রয়োগমাত্রা	প্রয়োগ পদ্ধতি
রিজেন্ট ৩জিআর	৩৩.০ কেজি/হেঃ	নালায় ইক্ষু সেট বসানোর পর সেটের উপর ছিটিয়ে প্রয়োগ করা এবং যথাশীঘ্র সেট ও কীটনাশক মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
অথবা		
রিজেন্ট ৫০এসসি	২.০ লিটার/হেঃ	নালায় সেট বসানোর পর পানিতে মিশিয়ে ঝাঁঝড়ির সাহায্যে সিঞ্চন করার পর সেট মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
অথবা		
রাগবি ১০জি/ পাউন্স ১.৫জি	২০.০ কেজি/হেঃ	সেট রোপণের সময় একবার (১ম) নালায় এবং মে মাসে পুনরায় (২য়) আখের সারির উভয় পাশে নালায় ছিটিয়ে প্রয়োগ করার পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
অথবা		
গাউচো ৭০ডাব্লিউ এস	২ গ্রাম/ লিটার পানি (৫০০ গ্রা./হেঃ	২ গ্রাম কীটনাশক ১লিটার পানিতে মিশিয়ে ঐ দ্রবণে ইক্ষুর বীজ আধঘন্টা ডুবিয়ে শোধন করার পর নালায় রোপণ করতে হবে।

অনুমোদিত কীটনাশকের নাম	প্রয়োগমাত্রা	প্রয়োগ পদ্ধতি
এডমায়ার ২০০ এসএল	১ লিটার/হেঃ (০.২০ কেজি এআই/হেঃ)	ইক্ষু সেট নালায় বসানোর পর কীটনাশক পানির সঙ্গে মিশিয়ে ট্রেঞ্চে প্রয়োগ করে বীজখন্ড মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
অথবা		
ডারসবান ২০ ইসি/ পাইরিফস ২০ইসি/ ক্লাসিক ২০ইসি	১১.২৫ লিঃ/হেঃ (৫০০ গ্রা./হেঃ	সেট লাগানোর সময় নালায় (১ম) এবং মার্চ (২য়) ও মে মাসে (৩য়) পানির সঙ্গে মিশিয়ে ইক্ষু সারির উভয় পাশে নালা কেটে নালায় সিঞ্চন করে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
অথবা		
লরস্‌বান ১৫জি	১৫.০ কেজি/হেঃ	প্রথম প্রয়োগ ঃ নালায় বীজ ফেলার পর কীটনাশক ছিটিয়ে প্রয়োগ করে বীজ আখ রোপণ সমাপ্ত করতে হবে। এছাড়া মার্চ (২য়) ও মে (৩য়) মাসে একই হারে আখের সারির উভয় পাশে নালা করে নালায় ছিটিয়ে প্রয়োগ করার পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
অথবা		
টালস্টার ২ডিব্লুউপি	১০.০ কেজি/হেঃ	প্রথম সেট লাগানোর সময় পানির সাথে মিশিয়ে নালায় সিঞ্চন করতে হবে। ২য় বার মে মাসে গাছের সারির উভয় পাশে নালা করে নালায় প্রয়োগ করার পর কোদাল দিয়ে ভালভাবে ঢেকে দিতে হবে।
অথবা		
ক্রুজার ৭০ডব্লিউএস	১০০ গ্রাম/ লিটার পানি (২৫০ গ্রাম/হেঃ)	১ গ্রাম কীটনাশক ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ঐ দ্রবণে আখের বীজ আধ ঘন্টা চুবিয়ে শোধনের পর নালায় রোপণ করতে হবে।
অথবা		
টিড্ডো ২০ইসি	৭ মিলি/ লিটার পানি (১.৭৫ লিটার/হেঃ)	৭ মিলি কীটনাশক ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ঐ দ্রবনে আখের বীজ আধ ঘন্টা চুবিয়ে শোধনের পর ট্রেঞ্চে রোপণ করতে হবে।

পাইরিলা হপার (*Pyrilla perpusilla pusana* Dist.)

ক) পোকার বর্ণনা ঃ

এদের পূর্ণবয়স্ক পোকা বাদামী রং এর। মাথা লম্বা ঠোঁটের মত। সামনের পাখা দুটো দো-চালা ঘরের ছাদের মত। এদের বাচ্চাগুলো হলদে সাদা রঙের। বাচ্চা অবস্থায় এদের কোন পাখা থাকে না। পেছনে সাদাটে লোমযুক্ত লম্বা ২টি গুচ্ছ থাকে।

খ) আক্রমণের লক্ষণ ঃ

১) পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ (Nymph) উভয়ই পাতার নীচে দলবদ্ধভাবে থেকে পাতার রস চুষে খায়। ফলে গাছের পাতা ক্রমশঃ হলদে থেকে বাদামী হয়ে যায় এবং পাতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্ন দেখা যায়।

২) রস চোষার সময় এদের গা থেকে এক রকম মিষ্টি লালা বের হয় যা বাতাসের আর্দ্রতায় মিশে পাতার উপরে কালো ছত্রাক রোগের সৃষ্টি করে।

গ) দমন ব্যবস্থাপনা ঃ

১) কৃষিতাত্ত্বিক পদ্ধতি ঃ

- নরম ও চওড়া পাতাবিশিষ্ট জাত পরিহার করা।
- বয়স্ক গাছ থেকে শুকনো মরাপাতা ছাড়ানো ও পুড়িয়ে ফেলা (আগষ্ট-অক্টোবর)।
- আগাম কর্তন অনুসরণ করা (অক্টোবর-জানুয়ারী)।
- কর্তনের পর মাঠের শুকনো পাতা, মোথা ইত্যাদি জড়ো করে পুড়িয়ে ফেলা।

২) যান্ত্রিক পদ্ধতি ঃ

- ডিমের গাদা পাতাসহ কেটে অথবা হাতে কাপড় পেচিয়ে পিষে ধ্বংস করা (ফেব্রুয়ারী-জুন)।
- হাত জাল ও টানা জালের সাহায্যে নিম্ফ ও পূর্ণাঙ্গ পোকা সংগ্রহ ও ধ্বংস করা (ফেব্রুয়ারী-জুন)।
- মোথা থেকে গজানো আখ কেটে ফেলা।

৩) জৈবিক পদ্ধতি ঃ

পরজীবি পোকা (*Epiricania, Tetrastichus* ইত্যাদি) মাঠে সংরক্ষণ ও বিস্তার করা।

ইক্ষুর রোগবালাই ও তার প্রতিকার

(ইক্ষুর রোগবালাই বিষয়ক চিত্রাবলী পৃষ্ঠা ৯৩-৯৫ দ্রষ্টব্য)

ইক্ষুর লাল পচা (Red rot) রোগ দমন

কলিটোট্রিকাম ফ্যালকাটাম (*Colletotricum falcatum*) নামক ছত্রাকের আক্রমণে লাল পচা রোগ হয়ে থাকে। প্রথমতঃ পাতার মধ্যশিরায় লাল দাগের সৃষ্টি হয় এ অবস্থায় একে মধ্যশিরার (মিড রিব) রেড রট বলে। পত্রফলকে ছোপ ছোপ লাল দাগ দেখা যায় তখন একে ল্যামিনা রেড রট বলা হয়। পরিপক্ক বয়সের ইক্ষুতে রোগের আক্রমণে ৩য় বা ৪র্থ পাতা প্রথমে হলুদাভ রং ধারণ করে। পরবর্তীতে অন্যান্য পাতাও হলদে হয়ে শুকিয়ে যায়। আক্রান্ত ইক্ষু লম্বালম্বিভাবে চিড়লে কান্ডের অভ্যন্তরে লম্বালম্বি লাল দাগ দেখা যায় এবং দাগের মাঝে মাঝে আড়াআড়িভাবে সাদা দাগ দৃশ্যমান হয়। এই সাদা দাগই এ রোগের বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন। আক্রান্ত গাছ থেকে এক ধরণের মদের ন্যায় গন্ধ বের হয়। পরবর্তীতে আক্রান্ত ইক্ষুর অভ্যন্তর ফাঁপা হয়। লাল পচা রোগাক্রান্ত ইক্ষু কিছু দিনের মধ্যে মারা যায় ও শুকিয়ে যায়। আক্রান্ত ইক্ষু থেকে চিনি অথবা গুড় তৈরী করা যায় না। সাধারণতঃ আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসেই এ রোগের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশী হয়।

১) অনুমোদিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতের চাষ করতে হবে।

২) ৫৪° সেঃ তাপমাত্রায় আর্দ্র গরম বাতাসে ৪ ঘন্টাকাল বীজ শোধন করে লাগাতে হবে অথবা ৫০° সেঃ তাপমাত্রার গরম পানিতে ৩ ঘন্টাকাল শোধন করে বীজ ব্যবহার করতে হবে।

৩) রোগাক্রান্ত গাছ দেখা গেলে তুলে মাটিতে পুতে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

৪) জমিতে পানি নিষ্কাশনের সু-ব্যবস্থা করতে হবে।

৫) মাজরা পোকা দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬) নীচু জলাবদ্ধ জমিতে ইক্ষুর চাষ বন্ধ করতে হবে।

৭) ইক্ষু কাটার পর পরিত্যক্ত অংশ ঐ জমিতেই পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

ইক্ষুর উইল্ট (Wilt) রোগ দমন

ফিউজারিয়াম মনিলিফরমি (*Fusarium moniliforme*) নামক ছত্রাকের আক্রমণে ইক্ষুর উইল্ট রোগ হয়ে থাকে। ইক্ষুর বয়স ৮-৯ মাস হলে এ রোগের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। আক্রান্ত গাছের পাতা নেতিয়ে পড়ে এবং উপর থেকে শুকাতে থাকে। আক্রান্ত ইক্ষু লম্বালম্বিভাবে চিড়লে কান্ডের মধ্যভাগে গিরার নিকটে গাঢ় লাল রং দেখা যায়। লাল পচা রোগের মতই উইল্ট রোগে আক্রান্ত আখের গিটের অংশে ইটের ন্যায় লাল হয় কিন্তু এক্ষেত্রে ছোপ ছোপ সাদা আড়াআড়ি দাগ দেখা যায় না। রোগের প্রকোপ বেশী হলে আক্রান্ত ইক্ষুর ভিতরে ফাঁপা হয় এবং কান্ড শুকিয়ে কুঁচকিয়ে যায়। খুব অল্প সময়ের মধ্যে আক্রান্ত জমির ইক্ষু শুকিয়ে যায়।

প্রতিকার ঃ

১) অনুমোদিত ও রোগ প্রতিরোধী জাতের চাষ করতে হবে। আক্রান্ত জমিতে পরবর্তীতে ইক্ষু চাষ না করে অন্য ফসলের আবাদ করা বাঞ্চনীয়।

২) জমিতে যথাযথ উর্বরতা এবং রস সংরক্ষণ করতে হবে।

৩) রোগাক্রান্ত জমিতে ইক্ষুর মুড়ি চাষ করা যাবেনা ।

৪) ইক্ষু কাটার পর মোথাসমেত সমস্ত মরা পাতা পুড়িয়ে ফেলতে হবে ও প্রখর রোদ্র দ্বারা আক্রান্ত জমির মাটি শুকানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

ইক্ষুর কালো শীষ (Smut) রোগ দমন

আসটিলাগো সিটামিনি (*Ustilago scitaminea*) নামক এক প্রকার ছত্রাকের আক্রমণে স্মাট রোগ হয়ে থাকে। ইক্ষুর বয়স ৩/৪ মাস থেকেই এ রোগ দেখা যায়। আক্রান্ত গাছের মাথা থেকে কাল চাবুকের মত কয়েক ফুট লম্বা একটা শীষ বের হয়। আক্রান্ত গাছ সাধারণতঃ খর্বাকৃতির হয়ে থাকে। কান্ড পেন্সিলের মত চিকন ও শক্ত হয় এবং বাড়তে পারে না। আক্রান্ত গাছের পাতাগুলো সরু, খাট ও খাড়া হয় এবং হালকা সবুজ রং ধারণ করে। সাধারণতঃ মুড়ি ইক্ষুতে এ রোগের আক্রমণ বেশী পরিলক্ষিত হয়।

প্রতিকার ঃ

১) আক্রান্ত গাছের ঝাড় শিকড়সমেত তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

২) রোগমুক্ত অনুমোদিত বীজ ব্যবহার করতে হবে।

৩) রোগাক্রান্ত জমিতে মুড়ি ইক্ষুর চাষ বন্ধ করতে হবে।

৪) রোগ-প্রতিরোধী জাতের চাষ করতে হবে।

মুড়ি খর্বা রোগ (Ratoon stunting disease) রোগ দমন

ক্লাভিব্যাকটার জাইলি (*Clavibacter xyli*) নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা রেটুন ষ্টানটিং রোগটি হয়ে থাকে। বাহ্যিকভাবে এ রোগের লক্ষণ বুঝা যায় না। আক্রান্ত গাছের বাড়-বৃদ্ধি কম হয় এবং পাতা হালকা সবুজ বর্ণ ধারণ করে। আক্রান্ত জমির ইক্ষু কোথাও উঁচু এবং কোথাও নীচু দেখা যায়। আক্রান্ত ইক্ষুর গিরাগুলো খুব সরু হয় অর্থাৎ পর্বগুলো লম্বায় ছোট হয়। আক্রান্ত ইক্ষুর গিরার অংশ ধারালো চাকু বা ছুরি দ্বারা পাতলা করে কাটলে লাল কমলা বা বাদামী বর্ণের ছোট ছোট বিন্দু বা কমার মত দাগ দেখা যায়। গিরায় এই ছোট ছোট লাল/কমলা দাগই হচ্ছে এ রোগের বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন। এ রোগের আক্রমণে ইক্ষু লম্বা ও মোটা হতে পারে না। ফলে ফলন অনেক কম হয়। সাধারণতঃ বীজের মাধ্যমেই এ রোগের বিস্তার হয়।

প্রতিকার ঃ

১) রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে।

২) ৫০° সেঃ তাপমাত্রায় গরম পানিতে ৩ ঘন্টাকাল শোধিত বীজ ইক্ষু রোপণ করতে হবে।

৩) আক্রান্ত জমি থেকে কোন ইক্ষু বীজ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

৪) আক্রান্ত ইক্ষু ক্ষেতে মুড়ি চাষ বাদ দিতে হবে।

৫) ইক্ষু কাটার যন্ত্র আগুনে পুড়িয়ে অথবা লাইসল দ্বারা শোধন করে ব্যবহার করতে হবে।

ইক্ষুর বীজ পচা (Pineapple disease) রোগ দমন

সেরাটোসিসটিস প্যারাডোক্সা (*Ceratocystis paradoxa*) নামক এক প্রকার ছত্রাকের আক্রমণে পাইনএ্যাপল রোগ হয়ে থাকে। রোগের জীবাণু মূলতঃ মাটিতে অবস্থান করে এবং ইক্ষুর বীজ লাগানোর পর তা আক্রমণ করে পচিয়ে দেয় ফলে বীজ গজাতে পারে না। অনেক সময় আক্রান্ত বীজের অঙ্কুরোদগম হলেও চারা গজানোর পরেই মারা যায়। আক্রান্ত ইক্ষুর বীজ লম্বালম্বিভাবে চিড়লে ভিতরে বাদামী বা কালচে রং দেখা যায় এবং ঘ্রাণ নিলে রোগের প্রাথমিক অবস্থায় পাকা আনারসের মত গন্ধ পাওয়া যায়।

প্রতিকার ঃ

১) রোগমুক্ত জমির অনুমোদিত বীজ ব্যবহার করতে হবে।

২) বীজ লাগানোর পূর্বে ব্যাভিষ্টিন/নোইন নামক ছত্রাকবারকের দ্রবণে (ঔষধ ও পানির অনুপাত ১ ঃ ১০০০) ৩০ মিনিটকাল ডুবিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে।

৩) অধিক ভিজা বা অধিক শুকনো মাটিতে ও ঠান্ডা আবহাওয়ায় ইক্ষু রোপণ করা যাবে না।

৪) জমি ভালভাবে চাষ ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫) বীজতলায় চারা তৈরী করে রোপণ করতে হবে।

ইক্ষুর সাদা পাতা (White leaf) রোগ দমন

মাইকোপ্লাজমা (*Mycoplasma*) নামক এক প্রকার জীবাণু দ্বারা সাদা পাতা রোগটি হয়ে থাকে। আক্রান্ত গাছের পাতা সাদা হয়ে যায়। অনেক সময় অঙ্কুরোদগম এর পরেই কচি পাতা সাদা রং ধারণ করে। আক্রান্ত গাছের কুশিসমূহ এবং বয়স্ক গাছের ডগার মধ্যস্থ পাতাও সাদা হয়। আক্রান্ত গাছের গড়ন খর্বাকৃতির হয়। বাড়-বৃদ্ধি খুব কম হয় এবং অধিক কুশি হয়। বয়স্ক ইক্ষুর চোখগুলো ফুটে যায় এবং সম্পূর্ণ সাদা বা সবুজ সাদা মিশ্রিত পার্শ্ব কুশি বের হয়। ইক্ষুর ফলন মারাত্মকভাবে কমে যায়।

প্রতিকার ঃ

১) সুস্থ সবল রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে।

২) ৫৪° সেঃ গ্রেঃ তাপমাত্রায় আর্দ্র গরম বাতাসে বীজ ৪ ঘন্টাকাল শোধন করে রোপণ করতে হবে।

৩) আক্রান্ত ইক্ষুর ঝাড় থেকে বীজ ব্যবহার করা যাবে না।

৪) রোগাক্রান্ত ইক্ষুর ঝাড় শিকড়সহ তুলে ফেলতে হবে।

ইক্ষুর ডগা পচা (Top rot) রোগ দমন

সিউডোমোনাস রুবরিলিনিয়ান্স (*Pseudomonas rubrilineans*) নামক এক প্রকার ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগটি হয়ে থাকে। প্রথম দিকে ইক্ষুর পাতায় শিরা বরাবর লম্বা, সরু এবং একই রকম লাল বা গাঢ় লাল রং এর টানা টানা বা ডোরা দাগ দেখা যায়। এই ডোরা দাগই এই রোগের বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন। প্রাথমিক অবস্থায় দাগগুলি আলাদা থাকলেও পরবর্তীতে অনেকগুলো দাগ একত্রিত হয়ে পাতার এক বিরাট অংশে বিস্তার লাভ করে। রোগের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেলে দাগগুলি পাতার নিচের দিকে বাড়তে থাকে এবং ডগায় আক্রমণ করে ডগা পচা রোগ সৃষ্টি করে। আক্রান্ত ডগার পচা অংশ থেকে গন্ধযুক্ত এক প্রকার পুঁজ বের হয় এবং আক্রান্ত অংশে ডগা ভেঙ্গে যায় ফলে ইক্ষুর বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণতঃ জুন-জুলাই মাসে যখন প্রচন্ড গরম ও বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকে তখন এ রোগ বেশি দেখা যায়।

প্রতিকার ঃ

১) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ইক্ষুজাতের চাষ করা।

২) নিয়মিতভাবে রোগাক্রান্ত পাতা এবং আক্রান্ত গাছের অংশবিশেষ কেটে পুড়িয়ে ফেলা।

৩) রোগমুক্ত অনুমোদিত বীজ ব্যবহার করা।

ইক্ষুর পরজীবি বিজলী ঘাস (Striga) রোগ দমন

ষ্ট্রাইগা ডেনসিফ্লোরা (*Striga densiflora*) বা বিজলী ঘাস ইক্ষুর একটি মারাত্মক পরজীবি উদ্ভিদ যা শিকড়ের সাহায্যে আখের শিকড় থেকে খাদ্যরস সংগ্রহ করে এবং সম্ভবতঃ এক প্রকার বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ইক্ষুর শিকড়ে প্রবেশ করিয়ে দেয়। ফলে ইক্ষু গাছ প্রথমে হলুদাভ হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে ইক্ষুর বৃদ্ধি বন্ধ হয় ও শেষে মারা যায়। দূর থেকে বিজলী ঘাস আক্রান্ত আখের জমি দেখলে মনে হয় যেন পুড়ে গেছে। মাটির ৪-১০ ইঞ্চি নিচেও বিজলী ঘাসের বীজ অঙ্কুরোদগম হয় এবং মাটির নিচেই কান্ড গজায়। মাটির নিচে থাকা অবস্থাতেই বিজলী ঘাস ইক্ষু গাছকে আক্রমণ করে। সে কারণে এ ঘাস মাটির উপরে জন্মানোর পূর্বেই ইক্ষুর অনেক ক্ষতি হতে দেখা যায়। বিজলী ঘাস লম্বায় ১-১.২৫ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। এর পাতা ছোট ছোট ও খসখসে সাদা ছোট ছোট ফুল হয় এবং খুব কম সময়েই ফুল থেকে বীজ হয়। বীজ বাতাসের সাহায্যে ছড়িয়ে যায়।

প্রতিকার ঃ

১) বিজলী ঘাসের আক্রমণ হয় এরূপ চিহ্নিত জমিতে সুষম সারের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে ইউরিয়া সার এবং পটাশ সার হেক্টর প্রতি যথাক্রমে ৩৯৫ কেজি এবং ২৪৭ কেজি সমান ৩ কিস্তিতে যেমন রোপণ সময়ে নালায়, বৃষ্টিপাতের পর এপ্রিল ও মে মাসে ইক্ষুর গোড়ায় প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

২) বিজলী ঘাস জমিতে দেখা গেলে ফুল ফোটার পূর্বেই তুলে ফেলতে হবে অথবা ইউরিয়া দ্রবণ (১ কেজি ইউরিয়া ২০ লিটার পানিতে মিশিয়ে দ্রবণ তৈরী করতে হবে) বিজলী ঘাসের উপর দুপুরের রোদ্রের সময় স্প্রে করতে হবে।

৩) আক্রান্ত জমিতে পরবর্তীতে ইক্ষুর আবাদ না করে পাট বা অন্যান্য ফসল চাষ করা উচিৎ।

৪) কোন অবস্থাতেই আক্রান্ত জমিতে মুড়ি ইক্ষুর আবাদ করা উচিত নয়।

ইক্ষুর মোজাইক (Mosaic disease) রোগ দমন

"মোজাইক" (Sugarcane Mosaic Virus) নামক এক প্রকার ভাইরাস দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। গাঢ় সবুজ রং এর পাতার মধ্যে হালকা সবুজ ফ্যাকাশে বা হলদে রং এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছোট ছোট টানা টানা দাগই এ রোগের প্রধান লক্ষণ। এ সকল হালকা দাগের নির্দিষ্ট কোন আকার নেই। তবে উহা পাতার লম্বালম্বি দিকে সমস্ত পাতা জুড়ে সমভাবে বিস্তৃত থাকে। পুরানো পাতার চেয়ে কচি পাতায় এ রোগের লক্ষণ অধিক পরিষ্কার বোঝা যায়। পরিপক্ক ইক্ষুর কান্ডেও অনেক সময় এ লক্ষণ প্রকাশিত হয় এবং কান্ডের উপরিভাগে ছোট ছোট চিঁর ধরে। ইক্ষু ঝাড়ের প্রতিটি পাতাতেই এ রোগের লক্ষণ দেখা যায়। এ রোগের ফলে ইক্ষুর ফলন কমে যায়।

প্রতিকার ঃ

১) রোগমুক্ত অনুমোদিত বীজ ব্যবহার করতে হবে।

২) রোগ প্রতিরোধী জাতের চাষ করতে হবে।

৩) জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৪) আক্রান্ত ঝাড় সম্পূর্ণ তুলে ফেলতে হবে।

৫) জমিতে সুষম সার ব্যবহার করতে হবে।

আখের পোড়া ক্ষত (Leaf sculd) রোগ দমন

জানথোমোনাস আলবিলিনিয়ান্স (*Xanthomonas albilineans*) নামক এক প্রকার ব্যাকটেরিয়ার আক্রমনে "লিফ স্কাল্ড" রোগ হয়ে থাকে। পাতার মধ্যশিরা বরাবর বা তার আশেপাশে খুব চিকন লম্বালম্বিভাবে পত্রফলকে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পাতার অগ্রভাগ থেকে নিচের দিকে ঝলসানো বা পোড়া ক্ষতের সৃষ্টি হয়। পূর্ণ বয়স্ক আখের প্রতিটি চোখ ফুটে পার্শ্বকুশি বের হয় এবং কুশিগুলিতে উল্লেখিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। আক্রান্ত গাছের কান্ড আড়াআড়িভাবে কাটলে উহাতে লালচে বা গাঢ় খয়েরি রং এর ছোট ছোট দাগ দেখা যায় অর্থাৎ ভাস্কুলার বান্ডলগুলো লাল দেখা যায়। অনেক সময় বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ না করেও এ রোগের কারণে ইক্ষুগাছ হঠাৎ শুকিয়ে মারা যায়। এ অবস্থাকে তীব্র লক্ষণ বলা হয়।

প্রতিকার ঃ

১) রোগ প্রতিরোধী ইক্ষুর চাষ করা উচিত।

২) বীজ ইক্ষুকে ৫৪° সেঃ তাপমাত্রার আদ্র গরম বাতাসে ৩-৪ ঘন্টাকাল শোধন করলে উহা রোগমুক্ত হয়। বীজ ইক্ষুকে ৫০° সেঃ তাপমাত্রার গরম পানিতে ৩ ঘন্টাকাল শোধন করলে উহা রোগমুক্ত হয়।

৩) জমিতে সুষম সার ব্যবহার করতে হবে।

৪) আক্রান্ত ইক্ষু ঝাড়সহ তুলে ফেলতে হবে।

ইক্ষুর আন্ত পরিচর্যা, ইক্ষু কাটা ও মুড়ি চাষ

আন্ত পরিচর্যা ঃ

বীজ বা চারা রোপণের পর থেকে ফসল কাটার পূর্ব পর্যন্ত ইক্ষুর ক্ষেতে যেসব কাজ করা হয় তার সবগুলোই অন্তঃবর্তী পরিচর্যা। এর মধ্যে রয়েছে ঃ

- ফাঁকা জায়গা পূরণ করা
- মাটি আলগা করে দে'য়া
- আগাছা পরিষ্কার করা
- সারের উপরি প্রয়োগ
- ইক্ষুর পাতা ও নাবী কুশি ব্যবস্থাপনা
- চারার গোড়ায় মাটি দেয়া
- সেচ ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা
- আখ বাঁধা

ফাঁকা জায়গা পূরণ করা ঃ

ইক্ষু রোপণের পর সন্তোষজনক অঙ্কুরোদ্গম না হলে জমিতে ফাঁকা স্থান দেখা যায়। প্রচলিত পদ্ধতির ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দু'ফুট দূরত্বের মধ্যে কোন চারা দেখা না গেলে সেখানে বীজ গজায়নি বলে ধরে নিতে হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব সেখানে বীজ/চারা দিয়ে ঐ ফাঁকা স্থান পূরণ করে দিতে হবে। রোপা ইক্ষুর ক্ষেত্রে চারা রোপণের ১০-১৫ দিনের মধ্যেই মৃত চারার শূণ্যস্থান পূরণ করে দিতে হবে। একই জাতের সমবয়সী চারা দিয়েই ফাঁকা স্থান পূরণ করা উত্তম।

মাটি আলগা করে দেয়া ঃ

মাটির মধ্যে স্বাভাবিক বাতাস প্রবেশ করতে না পারলে ইক্ষু গাছের শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করতে পারে না ফলে পর্যাপ্ত রস ও খাদ্য শোষণে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এতে বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। সেকারণেই ভারী বৃষ্টিপাতের পর কিংবা সেচ দেয়ার পর জমিতে জো আসার সঙ্গে সঙ্গে মাটি অবশ্যই আল্‌গা করে দিতে হবে। প্রচলিত চাষ পদ্ধতিতে মাঠে অংকুরোদগম শেষ হওয়ার আগেই বৃষ্টিপাত হলে পরবর্তীতে মাটি শুকিয়ে উপরিভাগে শক্ত স্তর পড়ে। এসময় কোদাল দিয়ে খুব সাবধানে উপরিভাগ হাল্কাভাবে কুপিয়ে দেয়া উচিত যাতে চারাগুলো সহজেই উঠে আসতে পারে। তবে সাবধান থাকতে হবে যেন চারা বা বীজের কোন ক্ষতি না হয়।

আগাছা দমন ঃ

আগাছা আখক্ষেতের পানি ও খাবারের জন্য প্রতিযোগিতা করে থাকে। তাছাড়া আগাছা অনেক রোগ ও পোকা মাকড়ের আশ্রয়স্থল হিসেবেও কাজ করে। তাই আগাছা দমন না করলে ইক্ষুর ফলন কমে যায়। সাধারণতঃ আগাছা দমন ও মাটি আল্‌গাকরণের কাজটি একই সঙ্গে করা হয়। এসময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন চারাগাছের শিকড়গুচ্ছ আঘাতপ্রাপ্ত না হয়।

সারের উপরিপ্রয়োগ ঃ

আখগাছ রোপণের সময় নাইট্রোজেন ও পটাশ জাতীয় সারের ১/৩ প্রয়োগ করা হয়। উক্ত সার দু'টির বাকী ১/৩ অংশ পথম বৃষ্টিপাতের পর কুশি গজানোর সময় (মাঘ-ফাল্গুন মাসে) এবং অবশিষ্ট ১/৩ অংশ কুশি গজানো শেষ হলে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে) উপরি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। ইক্ষুঝাড়ের চারপাশে রিং করে বা চক্রাকারে সারগুলো ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া উচিত।

ইক্ষুর পাতা ও নাবী কুশি ব্যবস্থাপনা ঃ

নাবী কুশি উৎপাদন এবং ইক্ষুর মরা/পুরাতন পাতা ইক্ষুর ফলন, চিনি আহরণ হার এবং উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দেয়। সেকারণেই এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে ১-২ বার প্রতিঝাড়ে ৮-১০ টি পুষ্ট কুশি রেখে অতিরিক্ত কুশি ও মরা/পুরাতন পাতা কেটে দিতে হবে (মোট পাতার ৫০%)। কুশি/পাতা কাটার পর ইক্ষুর গোড়ায় মাটি দিতে হবে। এ পদ্ধতিতে ইক্ষুর ফলন ১০-১৫% এবং গড় চিনি আহরণের হার ০.৩-১.০ ইউনিট বৃদ্ধি পায়। ইক্ষুর কর্তিত নাবী কুশি ও তাজা পাতা গো-খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

ইক্ষুর গোড়ায় মাটি দেয়া ঃ

ইক্ষু গাছে কুশি বের হওয়া শেষ হলে অর্থাৎ আগাম ইক্ষুর ক্ষেত্রে ৮-১০টি এবং নামলা ইক্ষুর ক্ষেত্রে ৫-৬ টি কুশি বের হওয়ার পর ইক্ষু গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে। এতে ইক্ষু গাছ শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, ঝড়-বাতাসে হেলে পড়ে না। তাছাড়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত কুশি হওয়া রোধ করে।

সেচ ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা ঃ

শীতের শেষে বাতাসের তাপমাত্রা বৃদ্ধি হয় এবং আদ্রতা কমে যায়। এতে মাটিতে রসের ঘাটতি দেখা যায়। ফলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এসময় কয়েক সপ্তাহ পর পর জমিতে ২ থেকে ৪ বার ৪-৫ ইঞ্চি পানি সেচ দিলে একর প্রতি ইক্ষুর ফলন অনায়াসে ৫০ টন করা সম্ভব। অন্যদিকে বর্ষাকালে অতি বৃষ্টির ফলে ইক্ষুক্ষেতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হলে মাটির খাদ্য উপাদানসমূহ নিচে নেমে যায় ফলে পুষ্টিহীনতার কারনে ইক্ষু গাছ দূর্বল হয়ে যেতে পারে এমনকি মারাও যেতে পারে। তাছাড়া শীতের শেষে যখন ইক্ষু গাছের বৃদ্ধি পূর্ণাঙ্গ হয় তখন অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে ইক্ষু গাছের দ্বিতীয় পর্যায়ের বৃদ্ধি শুরু হয়। এতে আখের অভ্যন্তরে চিনির পরিমাণ কমে যায়। এসব কারনেই ইক্ষু ক্ষেতের জমে থাকা পানি নালা কেটে বের করে দিতে হবে। ছোট ছোট ইক্ষুচাষীরা যৌথভাবে তাদের নিজ এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেন।

ইক্ষু বাঁধা ঃ

ভাদ্র থেকে কার্তিক মাসের মধ্যে ঝড়ো হাওয়ায় ইক্ষুগাছ হেলে পড়তে পারে। ইক্ষু গাছ হেলে পড়লে গাছের বৃদ্ধি থেমে যায়, পার্শ্বকুশি গজায়, ইক্ষুর মধ্যে চিনির পরিমাণ কমে যায়, ইক্ষুর ওজন কমে যায়, অনেকক্ষেত্রে ইক্ষুগাছ মরে যায় এবং বীজ হিসাবে ইক্ষুর গুণাগুণ হ্রাস পায়। সেকারণেই শুকনো ও অর্ধ শুকনো পাতা দিয়ে প্রতিটি ঝাড় আলাদাভাবে বেঁধে দিতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ইক্ষুর উপরের দিকের সবুজ পাতা নষ্ট না হয় এবং ইক্ষুর ডগাগুলো পরস্পরের সাথে জড়িয়ে না যায়।

ইক্ষু কাটা ঃ

ইক্ষুর বয়স ১২-১৪ মাস হলে তা পরিপক্ক হয় এবং কাটার উপযুক্ত হয়। অনেক চাষীই ভাদ্র-আশ্বিন মাসে গুড়ের দাম বেশি থাকায় ঐ সময়েই ইক্ষু কেটে গুড় তৈরী করে থাকেন। এসময় ইক্ষু পরিপূর্ণ পরিপক্ক হয়না ফলে ইক্ষুর মধ্যে গুড়ের পরিমাণ কমে যায়। আবার বেশি পরিপক্ক হলেও ইক্ষুর মধ্যে চিনি বা গুড়ের পরিমান কমে যায়। তাই সময়মতোই ইক্ষু কাটা উচিত। ধারালো কোদাল দিয়ে মাটির সমতলে বা মাটির একটু গভীরে থেকে ইক্ষুর গোড়া কাটা উচিত। দা বা হাসুঁয়া দিয়ে ইক্ষু কাটা উচিত নয়। এতে প্রায় ১০% ইক্ষু মাটিতেই থেকে যায় এবং মুড়ি ইক্ষু চাষের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে।

মুড়ি ইক্ষুর চাষ ঃ

মুড়ি ইক্ষু চাষে জমি তৈরী, বীজ রোপণ, বীজের খরচ ইত্যাদি খরচ নেই বলে মুড়ি ইক্ষু চাষে বিনিয়োগকৃত পুঁজির পরিমাণ কম এবং লাভ অনেক বেশি। মুড়ি ইক্ষুর মধ্যে চিনি বা গুড়ের পরিমাণও বেশি থাকে ফলে মুড়ি ইক্ষুর চাষ বৃদ্ধি করে চিনিকল এবং গুড় চাষীরা অধিক লাভবান হতে পারেন। মুড়ি ইক্ষু আবাদের ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে।

- মুড়িচাষের উপযোগী জাত হতে হবে। বিএসআরআই উদ্ভাবিত/সুপারিশকৃত উন্নত জাতগুলির মধ্যে ঈশ্বরদী ২-৫৪, এলজেসি, ঈশ্বরদী ১৮, ঈশ্বরদী ২০, ঈশ্বরদী ২১, ঈশ্বরদী ২৭, ঈশ্বরদী ২৮, ঈশ্বরদী ২৯, ঈশ্বরদী ৩০, ঈশ্বরদী ৩১, ঈশ্বরদী ৩২, ঈশ্বরদী ৩৩ এবং ঈশ্বরদী ৩৪ জাতগুলি মুড়ি ইক্ষু চাষের জন্য উপযোগী।
- যে জমিতে মুড়ি ইক্ষুর আবাদ করা হবে সেখানে অবশ্যই মাটি সমান করে ধারালো কোদাল দিয়ে মাটির সমান করে ইক্ষু কাটা উচিত।
- ইক্ষু কাটার একমাস পূর্বে একর প্রতি ২৫০০ চারা করে রাখতে হবে যাতে করে ইক্ষু কাটার ১৫ দিনের মধ্যেই ফাঁকা জায়গা দেখা দিলে তা ঐ চারা দিয়ে পূরণ করা যায়।
- মুড়ি ইক্ষু চাষ করা হবে এরূপ জমিতে ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি বা তার আগে ইক্ষু কাটতে হবে। তবে কোন অবস্থাতেই তীব্র শীতের মধ্যে ইক্ষু কাটা যাবে না। কারণ ঐ সময় ইক্ষুর গোড়ায় চোখগুলির গজানোর হার অনেক কম হয়।
- মুড়ি ইক্ষুর ক্ষেতটি সমভাবে চারা গজাতে হবে এবং ঐ ক্ষেতে সেচ ও নিকাশের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- রোগ ও পোকা-মাকড়ের উপদ্রব কম থাকা জমিতে মুড়ি ইক্ষুর চাষ করতে হবে। চারা ইক্ষুতে যদি লাল পচা, উইল্ট, স্মাট, সাদাপাতা, ঘাসীগুচ্ছ প্রভৃতি রোগ ও উঁইপোকা, গ্রাব ও গোড়ার মাজরা পোকার আক্রমণ থাকে তাহলে ঐ জমিতে মুড়ি চাষ করা উচিত নয়।
- ইক্ষু কাটার ৭ দিনের মধ্যেই মূল ইক্ষুর পরিত্যাক্ত অংশ পুড়িয়ে মোথা মাটির সমান করে কেটে ৩-৪ টি লাঙ্গল ও মই দিয়ে জমি তৈরী করতে হবে। এসময়ই অনুমোদিত মাত্রার অর্ধেক ইউরিয়া ও এমপি সার এবং সম্পূর্ণ টিএসপি সার জমিতে প্রয়োগ করে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে বাকী ইউরিয়া ও টিএসপি সার কুশি বের হওয়ার সময় উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। সারের মাত্রা মূল ইক্ষুর অনুরূপ তবে মুড়ি ইক্ষুর ক্ষেত্রে একর প্রতি এক মণ ইউরিয়া সার বেশি প্রয়োগ করতে হবে।

19452

ইক্ষু খামার যান্ত্রিকীকরণ

(ইক্ষু খামারে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ছবি পৃষ্ঠা ১০৩-১০৫ দ্রষ্টব্য)

বিএসআরআই বাড চীপ কাটিং মেশিন

প্রচলিত পদ্ধতিতে ইক্ষু রোপণের জন্য প্রায় ৬-৬.৫ টন ইক্ষু বীজের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিএসআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত এসটিপি পদ্ধতিতে ১ চোখ বা ২ চোখের ইক্ষু বীজ ব্যবহার করে বীজের পরিমাণ ১.৫-২.০ টনে নামিয়ে আনা যায়। তবে চারা তৈরীর জন্য ১ চোখ বা ২ চোখ ইক্ষুর বীজ ব্যবহার না করে শুধু মাত্র চোখটি (বাড চীপ) ব্যবহার করলে প্রতি হেক্টরে মাত্র ১১৬ কেজি ইক্ষুর প্রয়োজন হয়। এই বাড চীপ থেকে চারা উৎপাদন করে রোপা পদ্ধতিতে চাষ করে ইক্ষুর ফলনও অধিক পাওয়া যায়। তবে ইক্ষু হতে বাড চীপ আলাদা করার মত ভাল কোন ব্যবস্থা না থাকায় বাড চীপ সংগ্রহ করা খুবই কষ্টসাধ্য। এ অসুবিধা দূর করার লক্ষ্যে কৃষি প্রকৌশল বিভাগের বিজ্ঞানীগণ একটি পা চালিত বাড চীপ কাটিং মেশিন তৈরী করেছেন।

যন্ত্রটির বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

- যন্ত্রটি দিয়ে একজন শ্রমিক প্রতি দিন ৮৩৬০টি বাডচীপ কাটতে পারে।
- এক হেক্টর জমির বীজের ওজন ঃ ১১৬ কেজি ।
- বীজের সাশ্রয় ঃ (৬৫০০-১১৬) = ৬৩৩৪ কেজি/হেক্টর।
- চালনা শক্তি ঃ একজন শ্রমিক ১ পায়ে চাপ দিয়ে কাজ করতে পারে।
- তৈরী খরচ ঃ ২৬১০/-টাকা।

হ্যান্ড বাড চীপ কাটার

যন্ত্রটির বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

- এই যন্ত্রটি দিয়ে মাঠে দাড়ানো ইক্ষু হতে বাড চীপ সংগ্রহ করা যায় এবং ইক্ষু কাটা পর্যন্ত কিছুদিন ইক্ষুকে মাঠে রেখে দেয়া যায়।
- বাড চীপ কাটার হার ঃ
  - প্রতি ঘন্টায় প্রতিজন শ্রমিক ৪৬০টি চীপস কাটতে পারে।
  - প্রতিদিন প্রতিজন শ্রমিক ৩৩৭৭টি চীপস কাটতে পারে।
- বাড নষ্ট হওয়ার হার ঃ ৬-১২%
- এক হেক্টর জমির জন্য প্রয়োজনীয় বীজের ওজন = ১১৬ কেজি।
- বাডচীপ কাটার খরচ ঃ ৪০০/- টাকা প্রতি হেক্টর।
- তৈরী খরচ ঃ ৪০০/- টাকা/হেক্টর।

বিএসআরআই ড্রাইল্যাণ্ড উইডার

এই উইডার দিয়ে দুইজন শ্রমিক দুই দিকের হাতল ধরে ধাক্কা ও টান প্রক্রিয়ায় ইক্ষুর দুই সারির মাঝের ঘাস এবং আগাছা সহজেই কেটে ফেলতে পারে। ১৩.৫৬%

আদ্রতাবিশিষ্ট দোয়াশ মাটিতে এই উইডারের আগাছা পরিষ্কার করার সর্বোচ্চ হার ৯০.২৭% এবং প্রতি হেক্টরে প্রায় ৫৩.৮ শ্রমিক ঘন্টার প্রয়োজন হয়। আবার এটেল মাটির আদ্রতা যখন ১৬.২৪% তখন উইডিং কার্যকারিতার সর্বোচ্চ হার ৮৮% এবং ৭৭.৯৩ শ্রমিক ঘন্টার প্রয়োজন হয়।

যন্ত্রটি চালাতে এক সংগে ২ জন শ্রমিকের প্রয়োজন হয় এবং এর তৈরী খরচ ৩৫০/- টাকা মাত্র।

বিএসআরআই ইক্ষুর পাতা ছড়ানোর যন্ত্র

ইক্ষুর বৃদ্ধির সাথে সাথে নীচের পুরাতন পাতা মরে যায় এবং চিনি তৈরীতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এছাড়া মরা পাতা মাঠের ভিতরে বায়ু চলাচল ও আলো প্রবেশে বাঁধার সৃষ্টি করে। উপরন্তু এইসব মরা পাতার আড়ালে ইক্ষুর ক্ষতিকারক পোকা-মাকড় লুকিয়ে থাকে। এজন্য ইক্ষুর মরা পাতা পরিষ্কারের মাধ্যমে ইক্ষুকে পোকা-মাকড়ের হাত হতে রক্ষা ও ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব। সচরাচর হাত দিয়ে কার্যকরভাবে পাতা ছড়ানো যায় না বিধায় বিজ্ঞানীগণ ১৯৯৪ সালে সুগারক্যান হ্যান্ড ডিট্রাসার নামে একটি হ্যান্ড টুল উদ্ভাবন করেন।

হ্যান্ড টুলটি আখের নীচের অংশের পুরাতন এবং শুকনা পাতা ছাড়ানো এবং আখের ডগা কাটার কাজে ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রটি হাসুয়া অপেক্ষা অধিকতর সুবিধাজনক এবং কার্যকরী। যন্ত্রটির ক্ষমতা ১৮৮ বর্গমিটার/শ্রমিক-ঘন্টা, যা একজন শ্রমিক দ্বারা অবিরতভাবে করা যায়। যন্ত্রটির তৈরী খরচ ১৫০/-টাকা। স্থানীয় যেকোন ওয়ার্কশপ হতে সহজেই যন্ত্রটি তৈরী করা যেতে পারে।

বিএসআরআই মিনি হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট

স্বল্প পরিসরে ইক্ষুর বীজ শোধন করার জন্য বিএসআরআই মিনি হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ব্যবহৃত হয়। রেড রট, লিফ স্কাল্ড, আই স্পট, ডাউনি মিলডিউ রোগগুলি বিএসআরআই মিনি হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। দু চোখবিশিষ্ট ইক্ষুবীজ ৮২ কেজি এবং এক চোখবিশিষ্ট ইক্ষুবীজ ১০০ কেজি ১ জন বা ২ জন শ্রমিক দ্বারা ৪০-৮০° সে তাপমাত্রায় শোধন করা যায়। বিএসআরআই মিনি হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের নির্মাণ খরচ প্রায় ১৭,০০০/- টাকা।

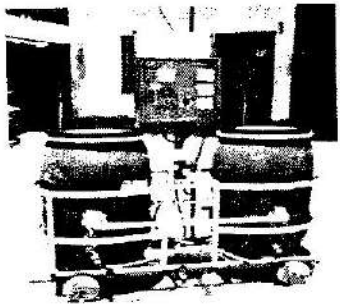

এ যন্ত্রের দ্বারা ইক্ষুবীজ শোধনের পদ্ধতি নিম্নে প্রদত্ত হ'ল ঃ

- প্রথমে ট্যাঙ্ক দুটিতে প্রয়োজনীয় পরিমান পুকুরের পানি/বৃষ্টির পানি দিয়ে ভর্তি করতে হবে।
- তারপর নিয়মানুসারে Plant এর Main Switch এবং Body Switch on করতে হবে, সেইসঙ্গে হিটারের সুইচও অন করতে হবে।
- ট্রিটমেন্ট এর জন্য প্রয়োজনীয় তাপ উঠলে একচোখ অথবা দুইচোখ বিশিষ্ট ইক্ষু খন্ড শোধনের জন্য ট্রেতে ভর্তি করে পানিতে ডুবিয়ে দিয়ে ঢাকনা বন্ধ করে দিতে হবে।
- ৫০°C তাপ উঠতে সময় লাগে ২ থেকে ৩ ঘন্টা এক সঙ্গে এক চোখ বিশিষ্ট ইক্ষুবীজ শোধন করা যায় ৫৫০০ সেট যার ওজন ১০০ কেজি ও ২ চোখ বিশিষ্ট ৩৩০০ সেট যার ওজন ৮২ কেজি।

  – ইক্ষু শোধনকালীন সময়ে মাঝে মধ্যে ট্যাংক এর তাপমাত্রা পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

  – শোধনের নির্দিষ্ট সময় শেষে ট্রে ট্যাংক হতে উঠিয়ে খড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। এতে করে সেটের বাইরের অংশ থেকে জলীয় বাষ্প বের হবে না যা চারা গজাতে সহায়ক হবে।

বিএসআরআই প্লান্টিং হ্যান্ড হো

এসটিপি পদ্ধতিতে ইক্ষুর পলিব্যাগ/সয়েল বেড চারা মাঠে রোপণ করার সময় মাঠে নালা তৈরী করা হয় এবং নালার তলদেশে ছোট গর্ত তৈরী করে চারা রোপণ করা হয়। নালার তলদেশে ছোট গর্ত এবং বড় ঢিলা ভাঙ্গার জন্য প্রচলিত হ্যান্ড হো কার্যকরী নয়। বিএসআরআই-এর বিজ্ঞানীরা ১৯৯৪ সালে প্লান্টিং হ্যান্ড হো নামের একটি হ্যান্ড টুল উদ্ভাবন করেন।

বিএসআরআই প্লান্টিং হ্যান্ড হো মাঠে পলিব্যাগের/সয়েল বেডের চারা রোপণের জন্যই শুধু ব্যবহৃত হয় না বরং আলগা মাটি অপসারণ, নালাতে মাটির বড় ঢেলা ভাঙ্গা এবং ফারোর তলাতে ছোট গর্ত করার জন্য বিএসআরআই প্লানটিং হ্যান্ড হো খুবই কার্যকরী। সাধারণ হ্যান্ড হোর চেয়ে এই হ্যান্ড হো দিয়ে চারা রোপণ করতে প্রতি হেক্টরে প্রায় ১২টি শ্রমিক দিন কম লাগে এবং এতে আখের উৎপাদন খরচ প্রায় ৬০০/- টাকা সাশ্রয় হয়।

চারা রোপণ হার ঃ প্রতিজন শ্রমিক প্রতিঘন্টায় ২২০টি চারা রোপণ করতে পারে।
শ্রমিক প্রয়োজন ঃ প্রতিহেক্টর ৪৫ শ্রমিক-দিন
তৈরী খরচ ঃ প্রতিটা ১০০/- টাকা।

বিএসআরআই প্যাডেল পাম্প

বিএসআরআই প্যাডেল পাম্পটি একটি পা-চালিত পাম্প। একটি সাধারণ ট্রেডেল পাম্পের সঙ্গে একটি ক্ষুদ্রাকৃতির ক্র্যাংকসেফ্ট এবং উহার এক পাশে ফ্লাই হুইল ও অপর পাশে চেইন স্প্রোকেট সংযুক্ত করে পাম্পটি তৈরী। এর সংগে বাইসাইকেলের সীট, ফ্রেম ও প্যাডেল সংযোজনের মাধ্যমে একজন লোক বাইসাইকেলের ন্যায় পাম্পটি দুই পা দিয়ে চালাতে পারে। প্যাডেল পাম্পের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ এবং ভূউপরিস্থ পানি তোলা যায়।

- পানি উত্তোলন ক্ষমতা ঃ প্রতি মিনিটে ৫৫-১০০ লিটার।
- সেচ ক্ষমতা ঃ প্রতিদিন ০.৫ একর।
- তৈরী খরচ ঃ ১,৫০০/-(এক হাজার পাচশত) টাকা।

গুড় উৎপাদন

(গুড় উৎপাদন বিষয়ক চিত্রাবলী পৃষ্ঠা ১০৮-১১২ দ্রষ্টব্য)

আবহমান বাংলার গ্রামীণ ঐতিহ্য গুড় এখনও এদেশের মানুষের কাছে যথেষ্ট জনপ্রিয়। ইক্ষু, তাল অথবা খেজুরের রস থেকে উৎপাদিত ঘণীভূত তরল কিংবা কঠিন পদার্থই গুড়। পিঠা-পুলি কিম্বা মিঠাই-মন্ডা তৈরীতে গুড়ের ব্যবহার এখনও উল্লেখযোগ্য। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত গুড়ের মান, আকার আকৃতি, ফলন এবং উৎপাদন প্রণালী বিভিন্ন রকম।

গুড় উৎপাদনের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় ধাপগুলি নিম্নরূপ ঃ

- রস নিষ্কাশন
- রস পরিষ্কারকরণ
- রস ঘণীভূতকরণ

ইক্ষু, খেজুর, তাল ও গোলপাতা থেকে গুড় তৈরী করা যায়। ইক্ষুর গুড় সারাদেশেই জনপ্রিয়। খেজুর ও তালের গুড় যশোর, নাটোরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন হয়। আর গোলপাতা থেকে গুড় তৈরী হয় কক্সবাজার, বরিশালসহ দেশের বেশ কিছু এলাকায়।

রস নিষ্কাশন ঃ সাধারণতঃ গরু বা মহিষ দিয়ে তিন রোলার বিশিষ্ট মাড়াই যন্ত্রে পিষে ইক্ষু থেকে রস বের করা হয়। ডিজেল/পেট্রোল/বিদ্যুত চালিত মাড়াই যন্ত্রের মাধ্যমেও অনেকেই ইক্ষু থেকে রস সংগ্রহ করে থাকে। তবে এসব ক্ষেত্রে সাধারণত ৪৫-৫৫% রস আহরণ করা যায়। সম্প্রতি বিএসআরআই পাঁচ রোলারবিশিষ্ট একটি উন্নত ইক্ষু মাড়াই যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে। এ যন্ত্রটি ব্যবহার করে অনায়াসে ৬১% এরও বেশি রস আহরণ করা যায়। তাই এ যন্ত্রটি ব্যবহারের মাধ্যমে একজন গুড় উৎপাদনকারী একই পরিমাণ ইক্ষু থেকে অধিক লাভবান হতে পারেন।

খেজুর গাছের রসের পরিমাণ নির্ভর করে গাছের কাটা অংশের আয়তনের উপর। আবার খুব বেশি দীর্ঘ করে কাটলে গাছ দুর্বল হয়ে যায়। তাল ও গোল পাতার রস আহরণ পদ্ধতি ভিন্ন রকমের। এ দু'টি গাছেরই পুষ্পমঞ্জরী থেকে রস আহরণ করা হয়। সঠিক সময়ে এবং সঠিক উপায়ে রস আহরণ করা না হলে এসব গাছ থেকেও রস আহরণের পরিমাণ কমে যায়।

রস পরিষ্কারকরণ ঃ রস পরিষ্কারকরণের উদ্দেশ্য হলো রসের মধ্যে থাকা সকল অনাকাঙ্খিত ও অপদ্রব্যাদি বের করে দেয়া। এতে রসের রং উজ্জল হয় এবং গুড়ের মান ও বাজার মূল্য বৃদ্ধি পায়। জৈব ও অজৈব বিভিন্ন ধরণের পরিষ্কারক দ্বারা রস পরিষ্কার করা হয়। এখানে কয়েকটি পরিষ্কারকের উপকারিতা ও অপকারিতা উল্লেখ

পরিষ্কারক দ্রব্য	উপকারিতা	অপকারিতা
ক) রাসায়নিক পরিষ্কারক হাইড্রোজ, চুনের পানি, সোডিয়াম কার্বনেট, সোডিয়াম-বাই-কার্বনেট, সুপার ফসফেট, ফটকিরি, ফসফরিক এসিড, সাইট্রিক এসিড, পটাসিয়াম-মেটা-বাইসালফেট মনো ক্যালসিয়াম ফসফেট ইত্যাদি।	- পরিমাণে কম লাগে - গুড়ের রং উজ্জল হয় - গুড়ের চাহিদা ও বাজার মূল্য বৃদ্ধি পায় - সহজে পাওয়া যায় - দ্রুত পরিষ্কার হয় - অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক	- স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর (পেটের পীড়া ও অম্লসহ পাকস্থলী ও অন্ত্রের বিভিন্ন ধরণের সমস্যা তৈরী হয়) - বাজার থেকে কিনতে হয় ফলে নগদ অর্থের প্রয়োজন হয়।
খ) উদ্ভিজ্জ পরিষ্কারক (ঘৃতকুমারী গাছের পাতা, বন ঢেঁড়শ, শিমূল, মান্দার প্রভৃতি গাছের বাকল থেতলে যে বিজল পদার্থ পাওয়া যায়)	- স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী - ঔষধি গাছ হওয়ায় পরোক্ষভাবেও উপকার করে - সহজে আবাদ করা যায় - গুড়ের আসল (অকৃত্তিম) রং পাওয়া যায় - কেনার জন্য নগদ অর্থের প্রয়োজন হয়না।	- পরিমাণে বেশি লাগে - কৃত্রিম রং দেয়া যায়না ফলে বাজারে চাহিদা কম থাকে।

উদ্ভিজ্জ পরিষ্কারকের পরিমাণ ঃ প্রতি কড়াই (২০০-২২০ লিটার) রসের জন্য ২ কেজি ঘৃত কুমারীর প্রয়োজন হয়। ঘৃত কুমারীর নির্জাস ফুটন্ত রসের মধ্যে মিশিয়ে দিলে রসের মধ্যে থাকা অপদ্রব্যসমূহ একত্রে জড়ো হয়ে রসের উপরে ভেসে ওঠে। এরপর তা সহজেই ছাঁকনি দিয়ে তুলে ফেলা যায়।

রাসায়নিক পরিষ্কারকের পরিমাণ ঃ রাসায়নিক পরিষ্কারক বিশেষত হাইড্রোজ ব্যবহার সাধারণভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়। তারপরও কেউ এ দ্রব্য ব্যবহার করতে আগ্রহী হলে তা ফুটন্ত রসের মধ্যে এবং খুব কম পরিমাণে (সর্বোচ্চ ৫০ গ্রাম/২০০-২২০ লিটার রস) ব্যবহার করতে হবে।

রস ঘনীভূতকরণ ঃ রস ঘনীভূতকরণ একটি বিশেষ প্রক্রিয়া। রস পরিষ্কার করার পর কড়া জ্বালে (১১০-১১৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়) ফুটিয়ে তা থেকে অধিকাংশ জলীয় পদার্থ বাষ্পীভূত করে দে'য়া হয়। এভাবে ফুটন্ত রস ঘন সিরাপে পরিণত হয়। রস জ্বাল থেকে নামানোর উপযোগী হয়েছে কিনা তা বোঝার জন্য কয়েক ফোঁটা সিরাপ/রস পরিষ্কার ঠান্ডা পানিতে ফেলে দেখতে হবে যে তা জমাট বাঁধে কিনা। যদি তা জমাট বাঁধে এবং পানিতে ছড়িয়ে না যায় তাহলে বুঝতে হবে যে রস জ্বাল থেকে নামানোর সময় হয়েছে। এ অবস্থায় কড়াই ভর্তি রস জ্বাল থেকে নামিয়ে কাঠের হাতলের সাহায্যে কিছুটা ঠান্ডা করতে হবে। এরপর চাহিদামত কাঠের বা মাটির ইপ্সিত আকার/ আকৃতির ছাঁচে ঘনীভূত ঐ রস/সিরাপ ঢালতে হবে। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ রেখে দিলেই ঐ রস ঠান্ডা হয়ে জমাট বেঁধে যাবে এবং তা গুড় হিসেবে বিক্রি অথবা সংরক্ষণ করা যাবে।

গুড়ের মান নিয়ন্ত্রণ ঃ গুড়ের মান নির্ভর করে নিম্নলিখিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর।

১) উপযুক্ত ইক্ষুজাত নির্বাচন
২) পরিমাণমত সার ব্যবহার ও ফসলের প্রয়োজনীয় পরিচর্যা
৩) রসের মধ্যে থাকা অচিনিজাত দ্রব্যাদি।

গুড় সংরক্ষণ ঃ উৎপাদিত গুড় গুদামজাত করার জন্য আবহাওয়া, স্থানীয় কৃষ্টি এবং উপকরণের সহজলভ্যতার উপর গুরুত্ব দে'য়া প্রয়োজন। এক এক অঞ্চলে এক এক ভাবে গুড় সংরক্ষণ করা হয়। যেমন সিরাজগঞ্জ ও জামালপুরে ছোট ছোট মুঠি তৈরী করা হয়। এগুলিকে পৃথকভাবে পলিথিনের প্যাকেটে ভরে তারপর একটি বড় বস্তায় মুখ বন্ধ করে সংরক্ষণ করা হয়। মানিকগঞ্জ ও পাবনার বেড়া অঞ্চলে গুড় বড় বড় মাটির পাত্রে (কোলা) সংরক্ষণ করা হয়। অন্যদিকে যশোরে উৎপাদিত গুড় সাধারণতঃ ছোট মাটির পাত্রে সংরক্ষণ করা হয়। যেভাবেই রাখা হোক না কেন গুদাম ঘরের তাপমাত্রা ও আদ্রতা যেন নিম্ন থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রয়োজনে ইক্ষুর পাতা, ধানের তুষ প্রভৃতি দিয়ে বিভিন্ন স্তরে গুড় রাখা যেতে পারে। সম্ভব হলে গুদামে আদ্রতানাশকও (ক্যালসিয়াম কোরাইড/ কালিচুন) ব্যবহার করা যেতে পারে।

উন্নত পদ্ধতিতে ইক্ষুচাষ বিষয়ক ধারাবাহিক চিত্রাবলী

আখের জাত সনাক্তকরণের সহায়ক অঙ্গসংস্থানসমূহ

বিভিন্ন ধরণের চোখ

ক্রিকোণাকৃতি ডিম্বাকৃতি অবোভেট পেন্টাগনাল রম্বয়েড

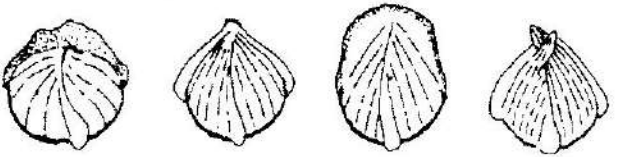

গোলাকার ওভেট চতুস্কোণাকৃতি বিক্‌ড

বিভিন্ন ধরণের পর্বমধ্য

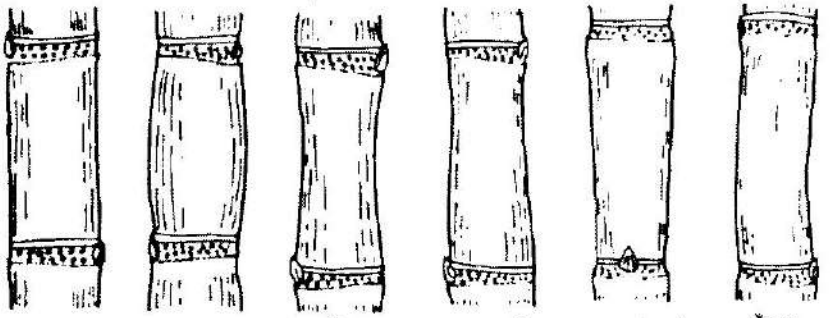

সিলিন্ডারের মত টিউমেসসেন্ট ববিন মোচাকৃতি অবকনোয়ডাল বাঁকা

বিভিন্ন ধরণের অরিকল

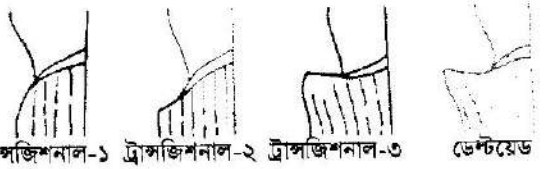

ট্রান্সজিশনাল-১ ট্রান্সজিশনাল-২ ট্রান্সজিশনাল-৩ ডেল্টয়েড

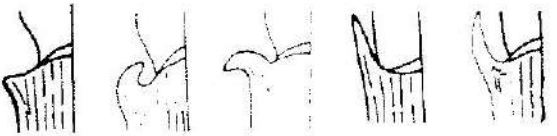

ডেল্টয়েড আনসিফর্ম ক্যালকেরিফর্ম বর্শাকৃতি ফালকেট

উন্নত ইক্ষুজাতসমূহ ও তাদের সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য

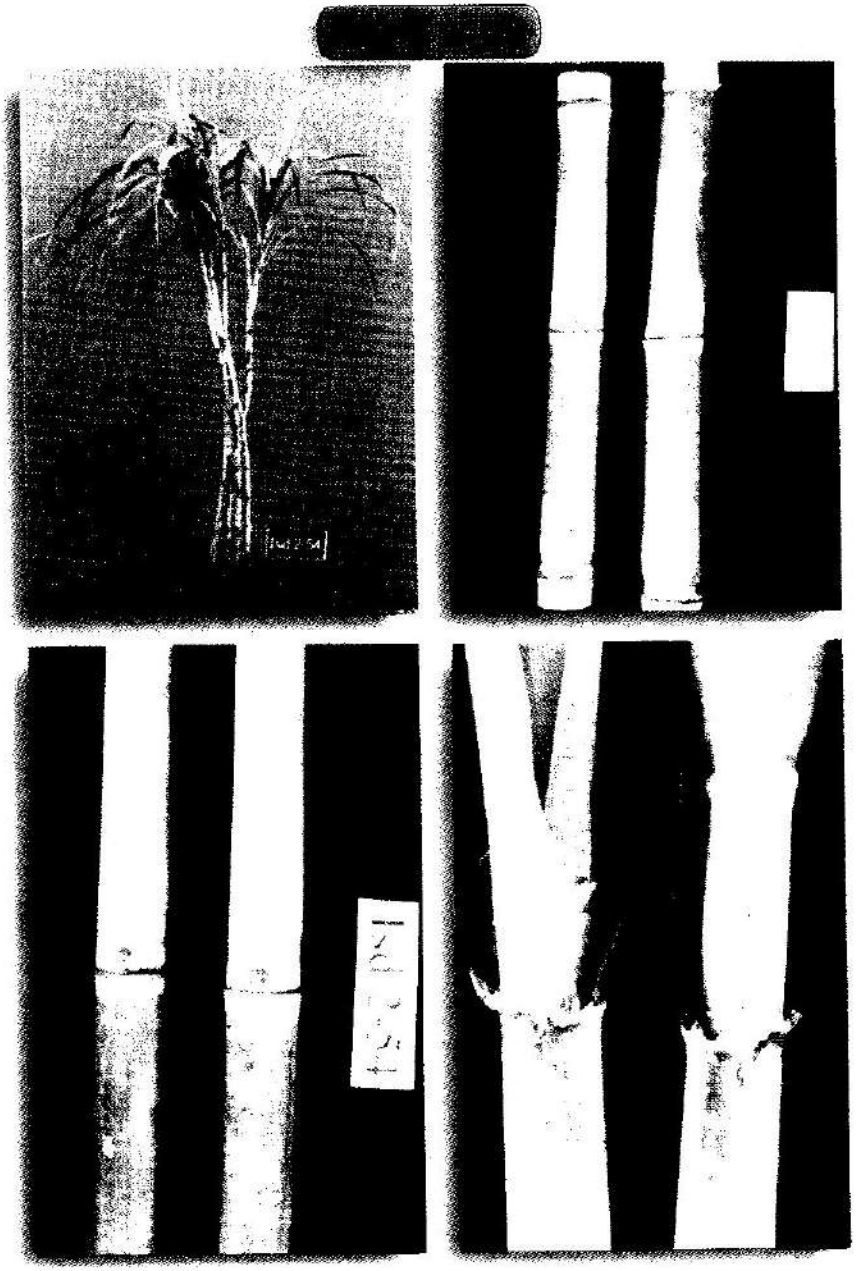

এটি একটি অপুষ্পক জাত। এর পর্বমধ্য সিলিন্ডার আকৃতির, চোখ ওভেট, বাইরের অরিকল ট্রান্সজিশনাল-৩, ভিতরের অরিকল ট্রান্সজিশনাল-১।

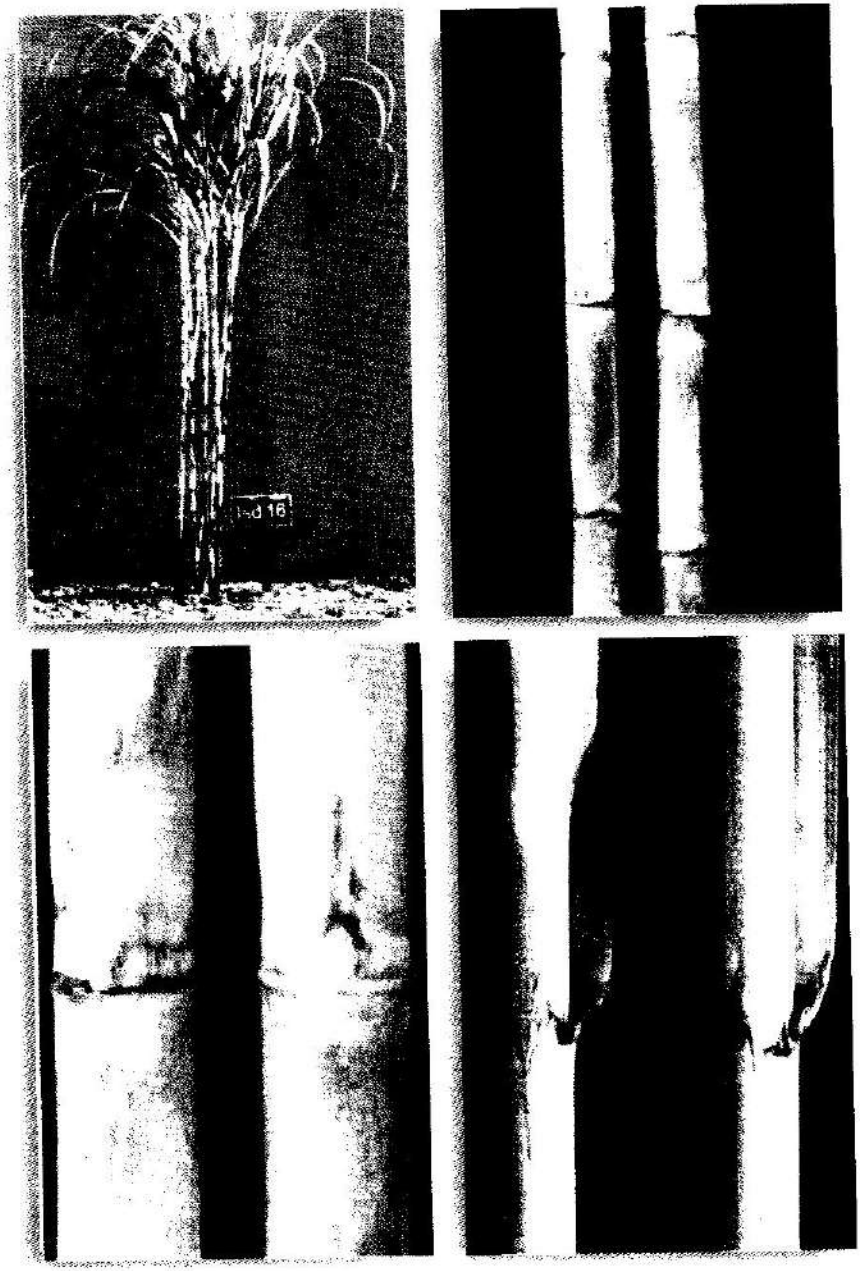

ঈশ্বরদী ১৬

এটি একটি সপুষ্পক জাত। এর পর্বমধ্য সিলিন্ডার আকৃতির, বাডগ্রুভ স্পষ্ট, চোখ চতুষ্কোণাকৃতির, বাইরের অরিকল ডেল্টয়েড, ভিতরের অরিকল বর্শাকৃতির।

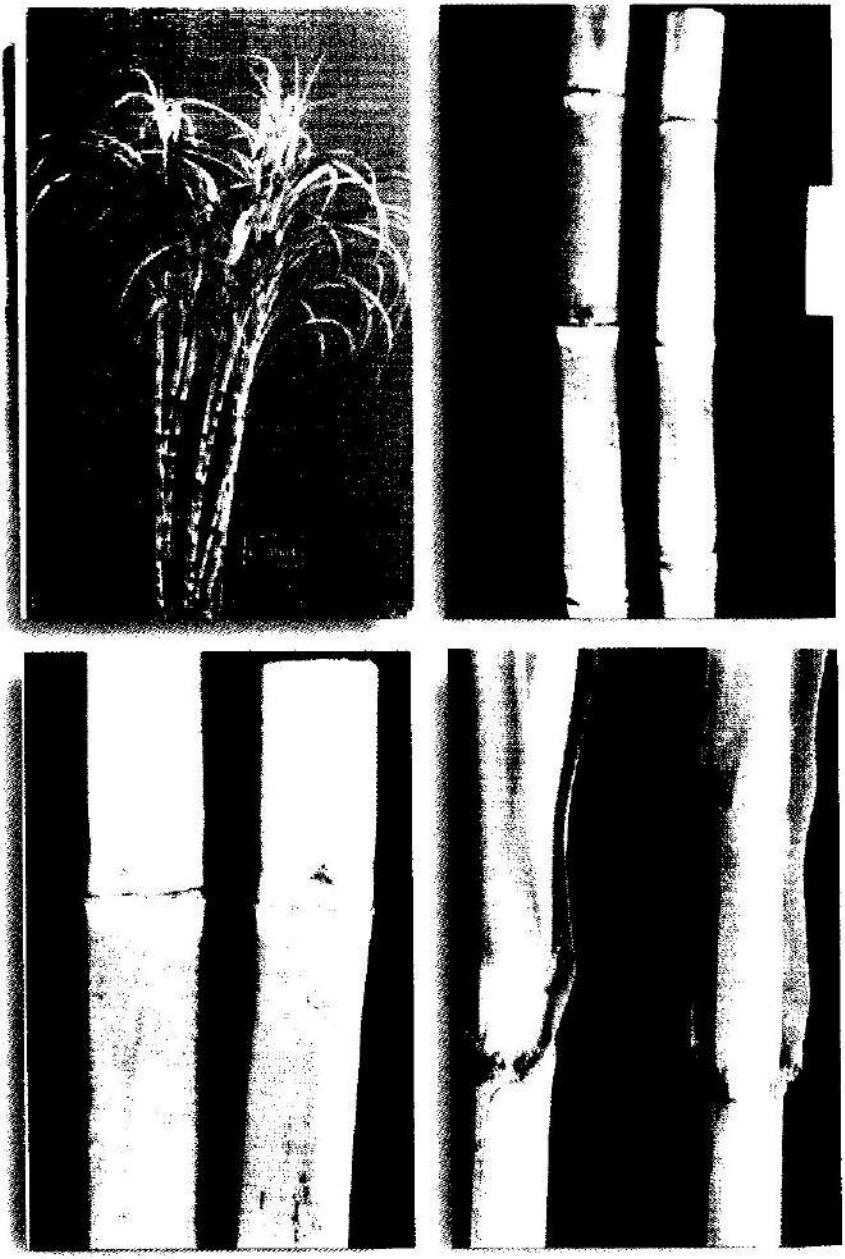

এটি একটি অপুষ্পক জাত। এর পর্বমধ্য সিলিন্ডার আকৃতির, চোখ ওভেট, বাইরের অরিকল ট্রান্সজিশনাল-২, ভিতরের অরিকল ছোট, বর্শাকৃতির

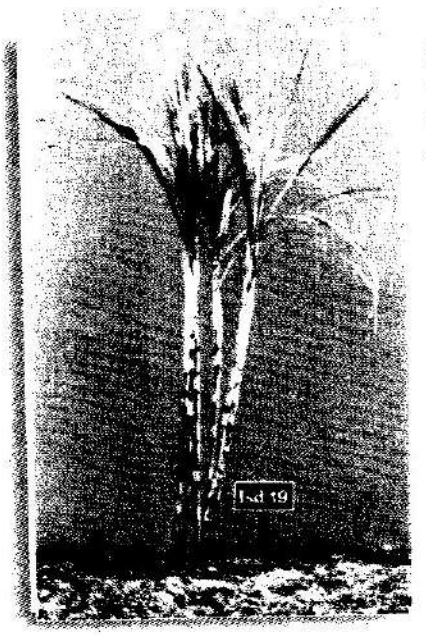

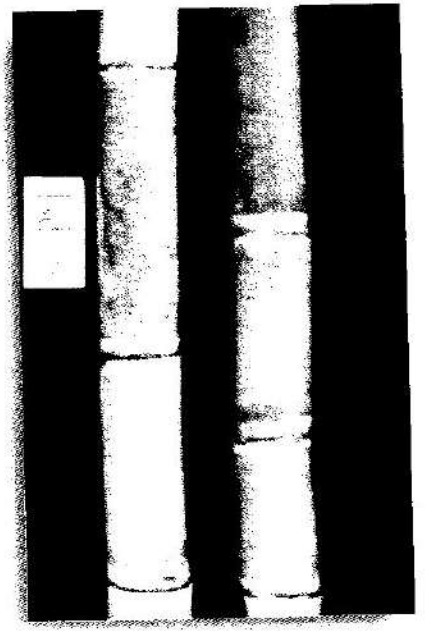

এটি একটি সপুষ্পক জাত। এর পর্বমধ্য মোচাকৃতির, চোখ ডিম্বাকৃতির, বাইরের অরিকল ডেলটয়েড, ভিতরের অরিকল ট্রান্সজিশনাল-৩।

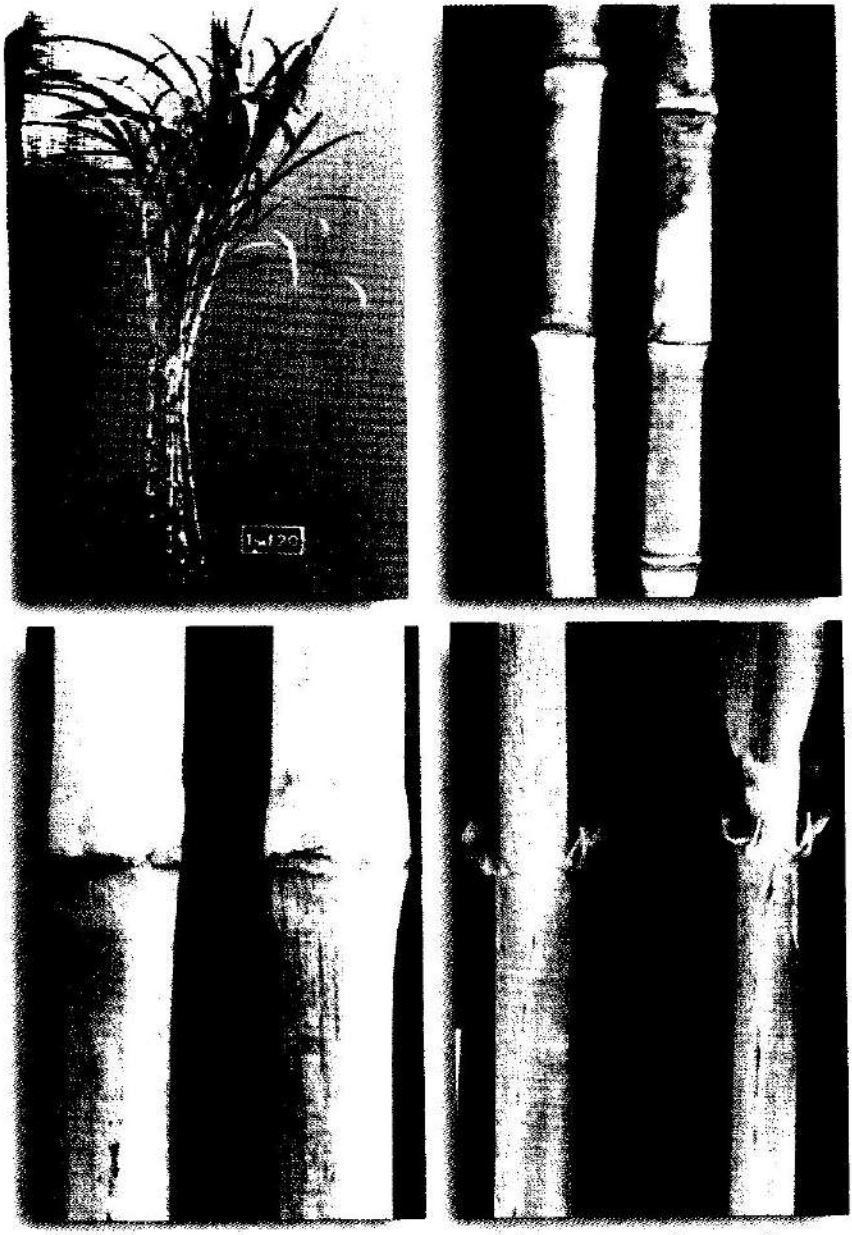

এজাতে কদাচিৎ ফুল হয়। এর পর্বমধ্য মোচাকৃতির, চোখ বড়, ত্রিকোণাকৃতির, বাইরের অরিকল ডেন্টয়েড, ভিতরের অরিকল ডেল্টয়েড, বাডগ্রুভ স্পষ্ট।

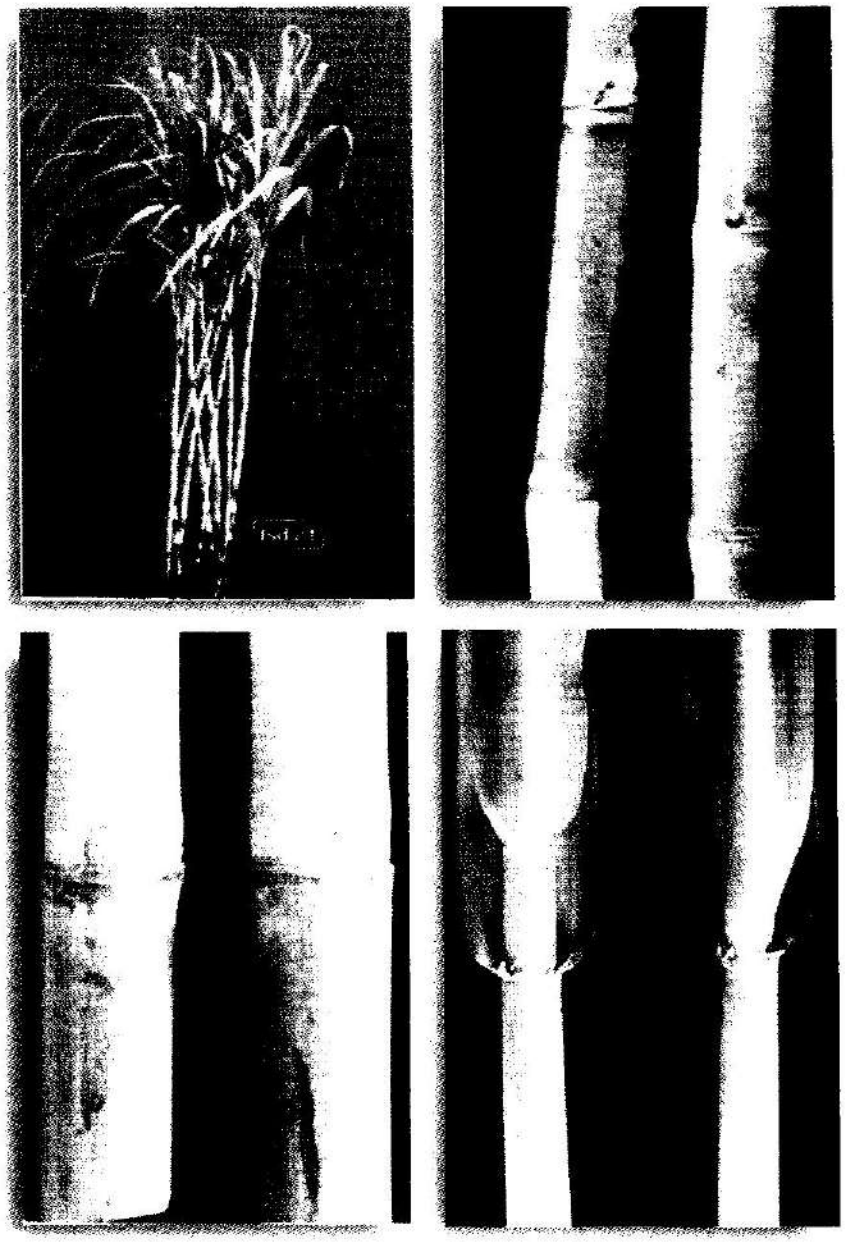

এটি একটি সপুষ্পক জাত। এর পর্বমধ্য মোচাকৃতির, চোখ ওভেট, বাইরের অরিকল ডেন্টয়ড, ভিতরের অরিকল ট্রান্সজিশনাল-১।

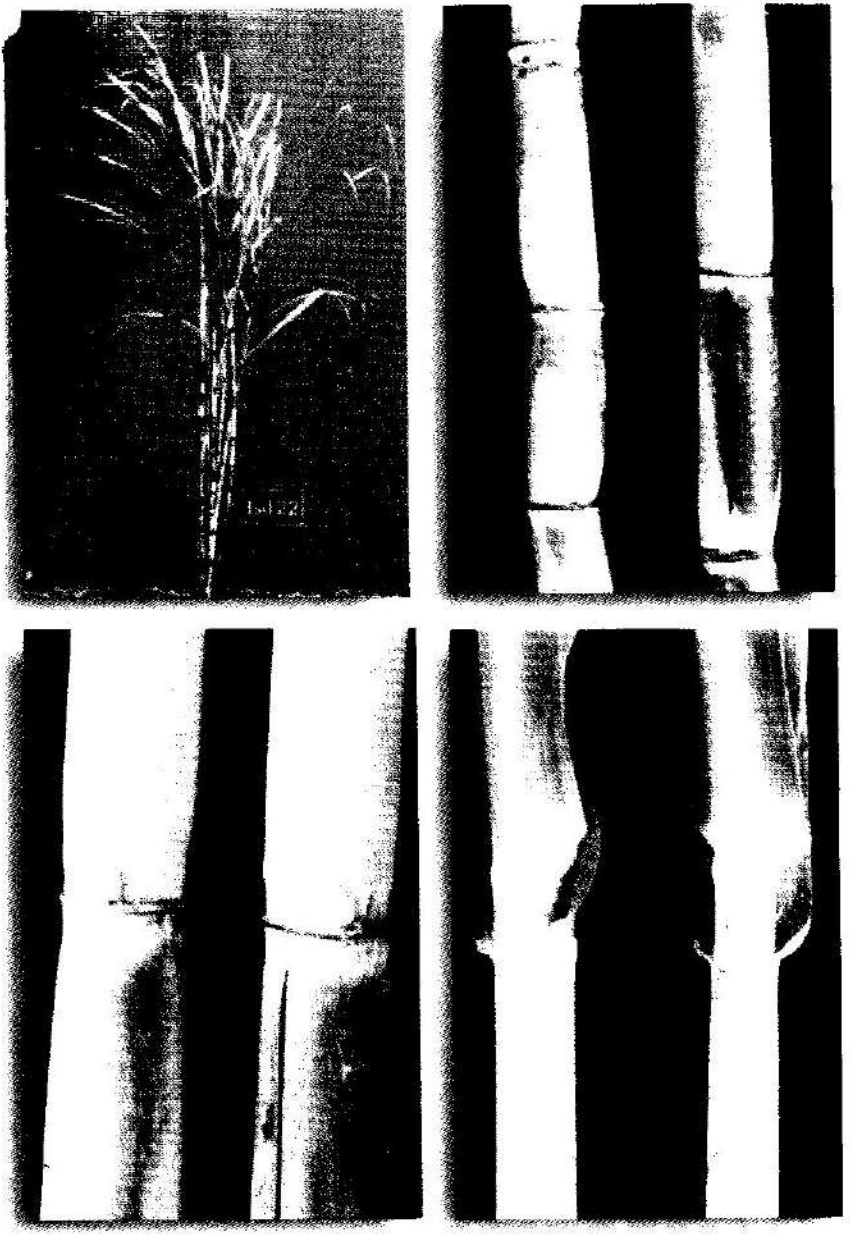

এটি সপুষ্পক জাত। এর পর্বমধ্য সিলিন্ডার আকৃতির, বাইরের অরিকল ডেন্টয়েড, ভিতরের অরিকল ট্রান্সজিশনাল-৩, চোখ ওভেট।

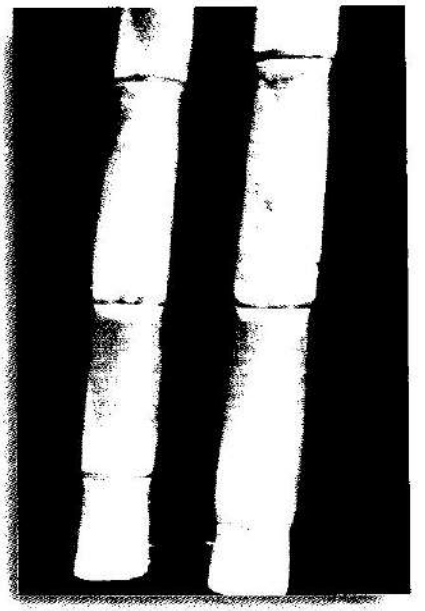

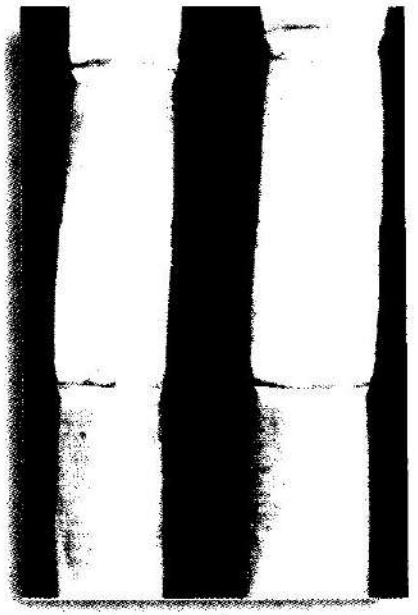

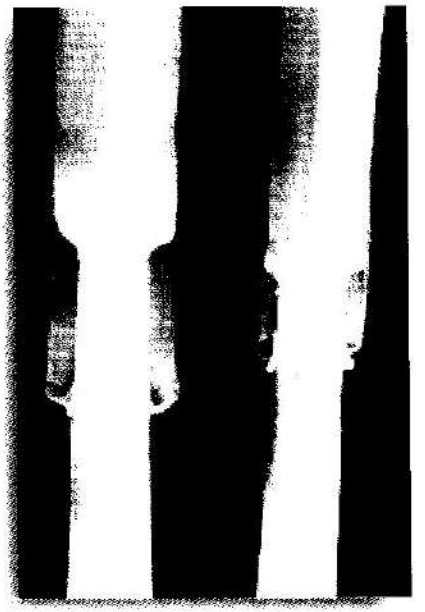

এ জাতে কদাচিৎ ফুল হয়। এর পর্বমধ্য সিলিন্ডার আকৃতির, বাইরের অরিকল ট্রান্সজিশনাল-২, ভিতরের অরিকল ছোট, বর্শাকৃতির, চোখ ওভেট।

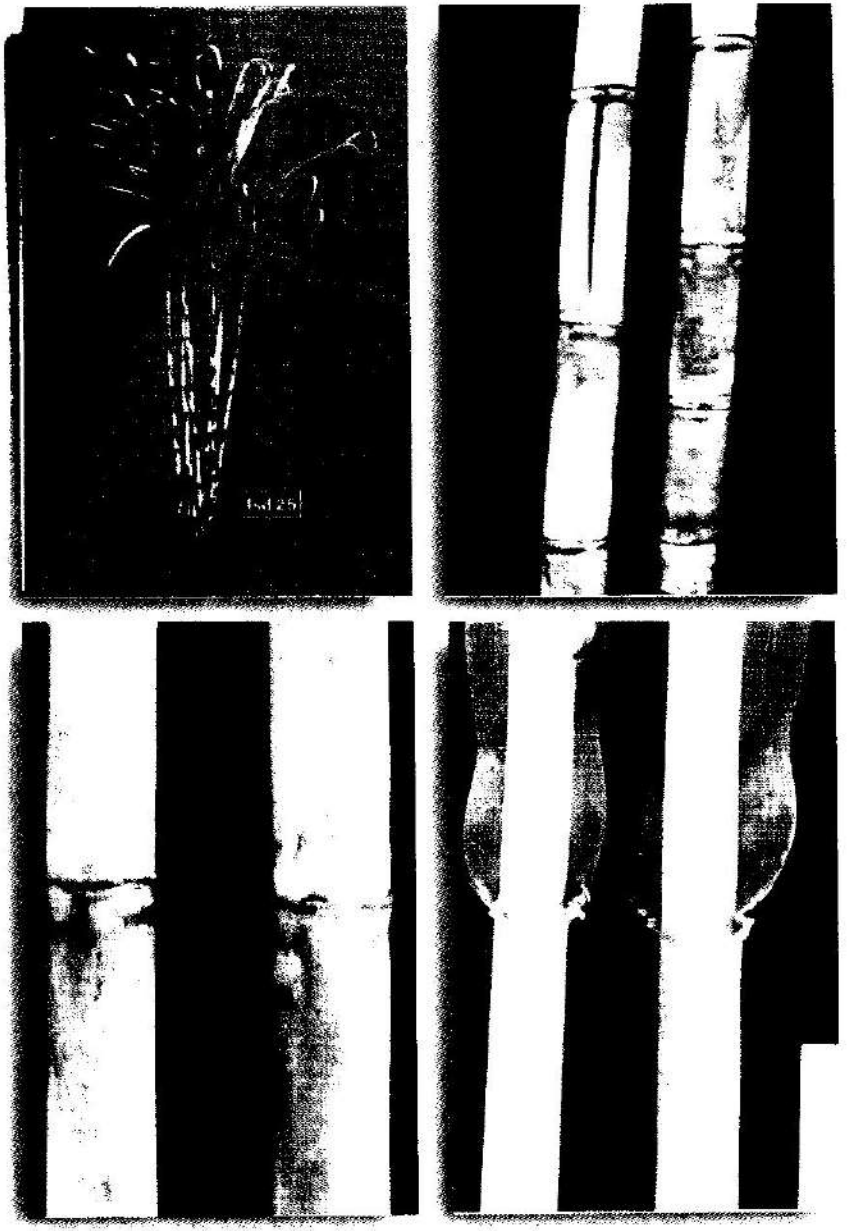

এটি সপুষ্পক জাত। এর পর্বমধ্য সিলিন্ডার আকৃতির, বাইরের অরিকল ট্রান্সজিশনাল-২, ভিতরের অরিকল ট্রান্সজিশনাল-১, চোখ ওভেট।

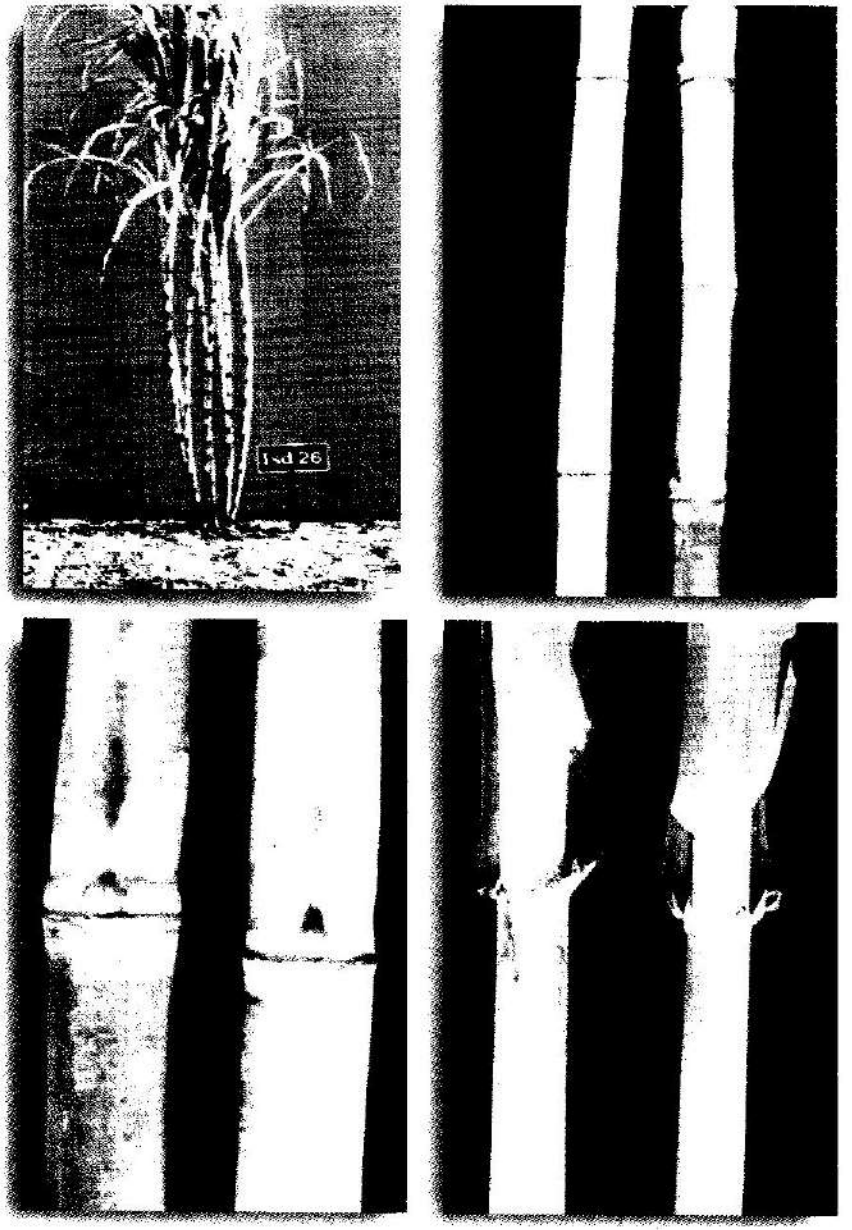

এটি অপুষ্পক জাত। এর পর্বমধ্য সিলিন্ডার আকৃতির, বাইরের অরিকল ডেল্টয়েড, ভিতরের অরিকল লম্বা, বর্শাকৃতির, চোখ চতুষ্কোণাকৃতির।

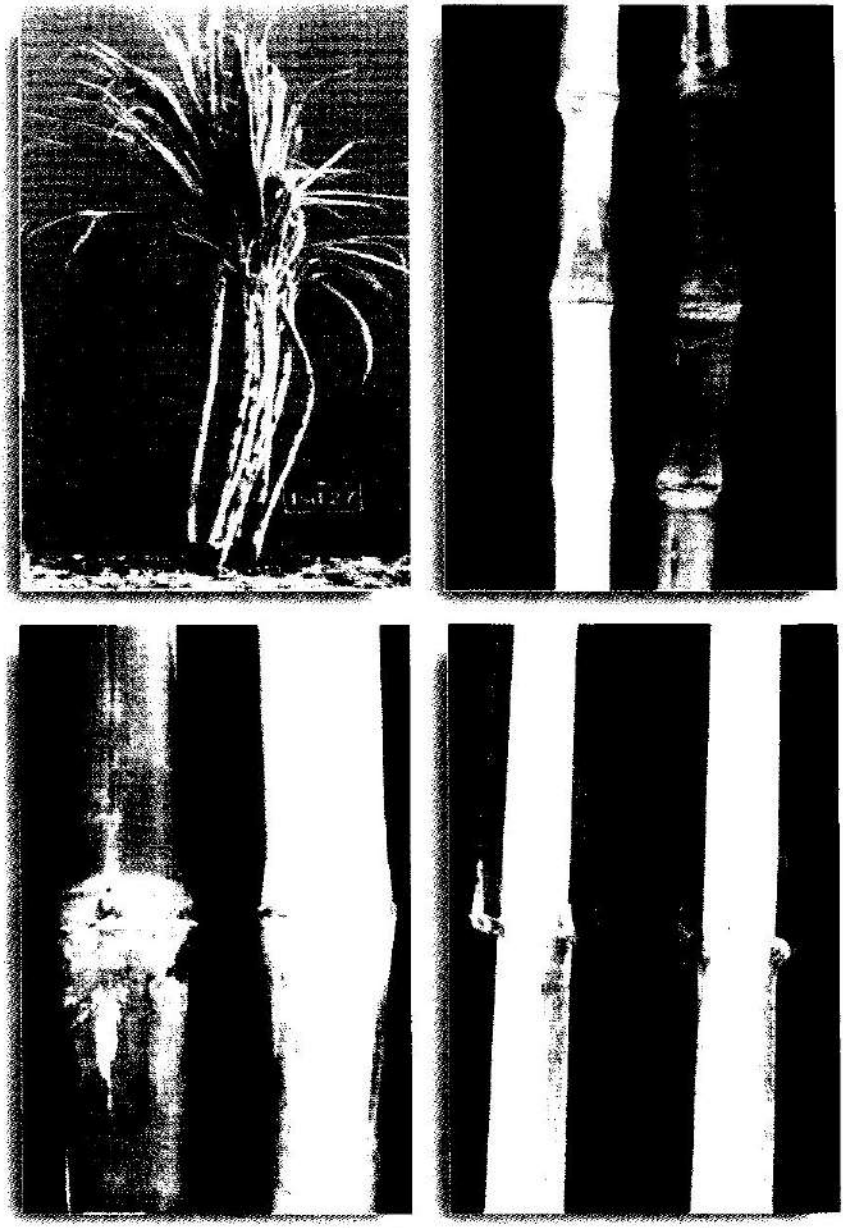

এটি অপুষ্পক জাত। এর পর্বমধ্য সিলিন্ডার আকৃতির, বাইরের অরিকল ট্রান্সজিশনাল-২, ভিতরের অরিকল ট্রান্সজিশনাল-৩, চোখ ওভেট।

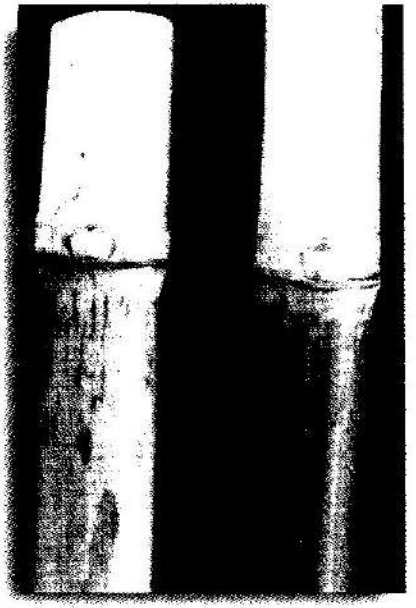
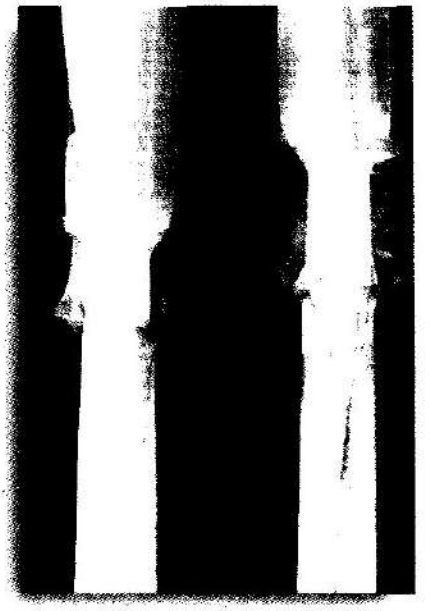

এটি সপুষ্পক জাত। এর পর্বমধ্য মোচাকৃতির, বাডগ্রুভ স্পষ্ট, বাইরের অরিকল ডেল্টয়েড, ভিতরের অরিকল বর্শাকৃতির, চোখ ডিম্বাকৃতির।

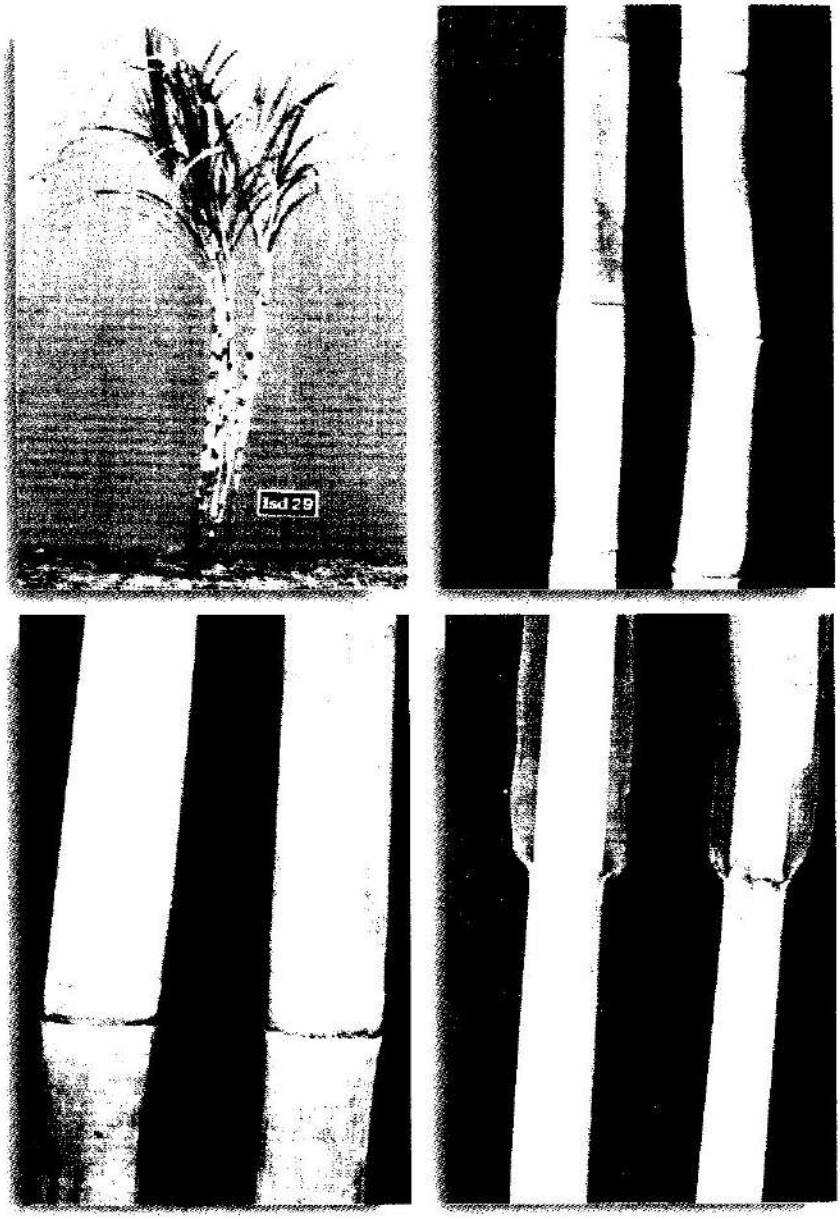

এটি সপুষ্পক জাত। এর পর্বমধ্য সিলিন্ডার আকৃতির, বাইরের অরিকল ট্রান্সজিশনাল-৩, ভিতরের অরিকল ছোট, বর্শাকৃতির, চোখ ওভেট।

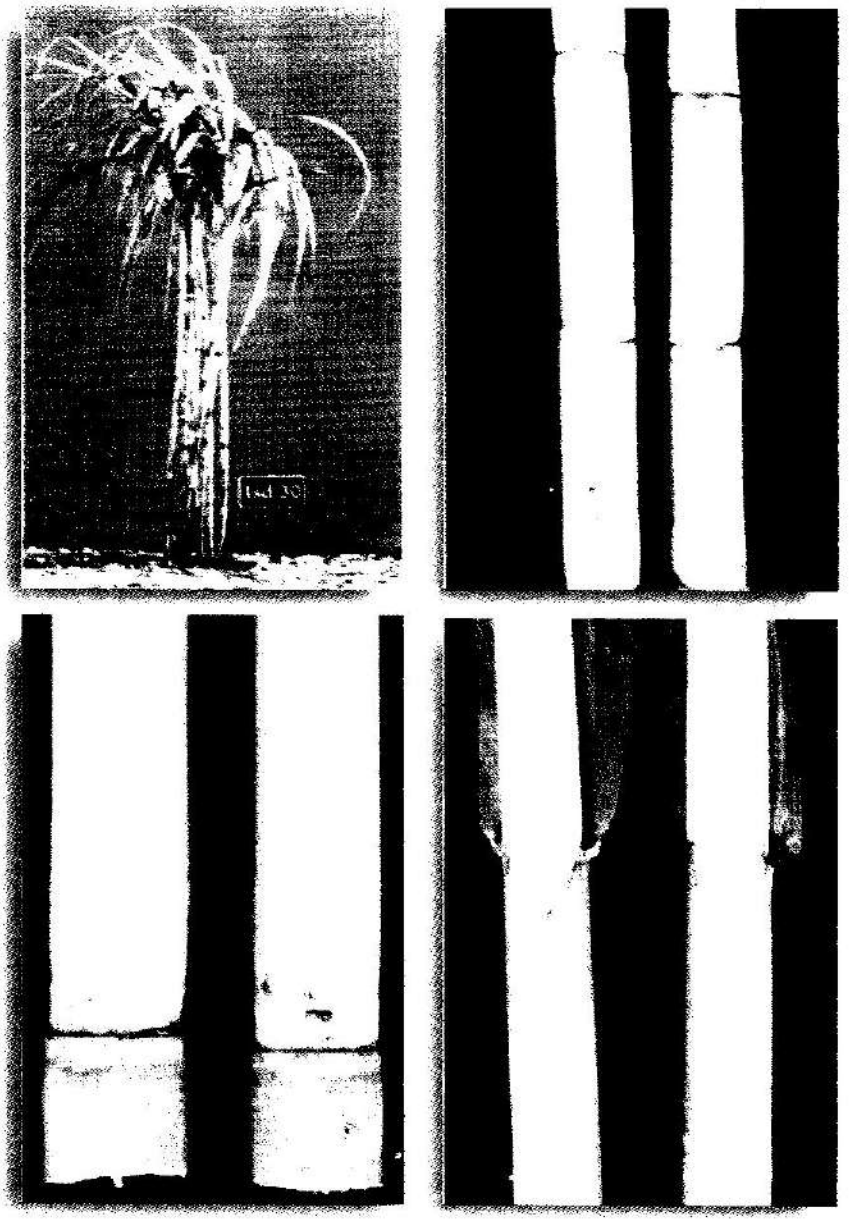

এটি সপুষ্পক জাত। এর পর্বমধ্য সিলিন্ডার আকৃতির, বাইরের অরিকল বর্শাকৃতির, ভিতরের অরিকল বর্শাকৃতির, চোখ ওভেট।

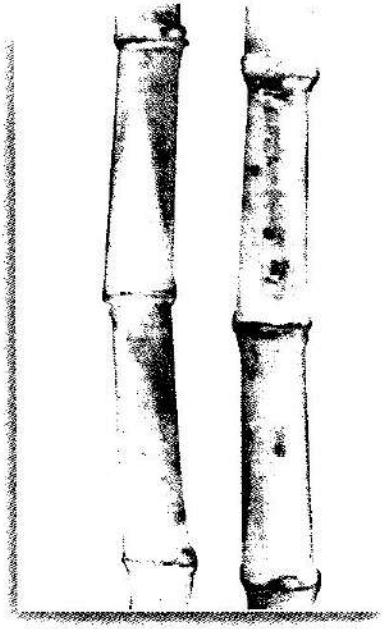

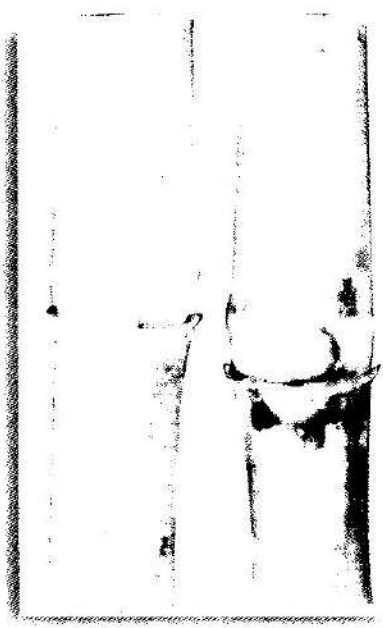

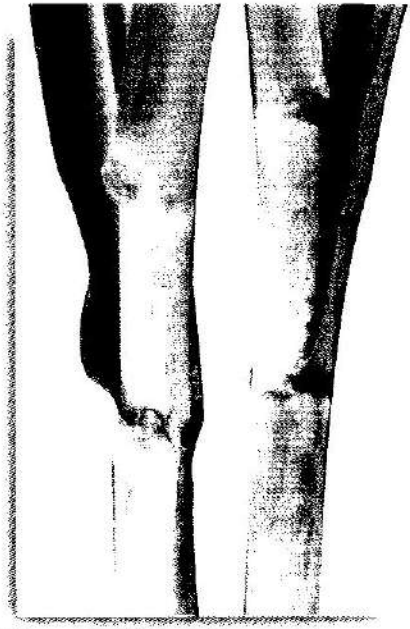

এটি সপুষ্পক জাত। এর পর্বমধ্য সিলিন্ডার আকৃতির, বাইরের অরিকল ট্রান্সজিশনাল-৩, ভিতরের অরিকল ছোট, বর্শাকৃতির, চোখ ওভেট।

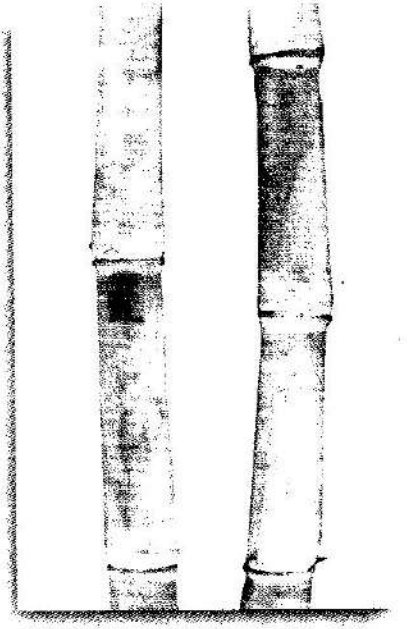

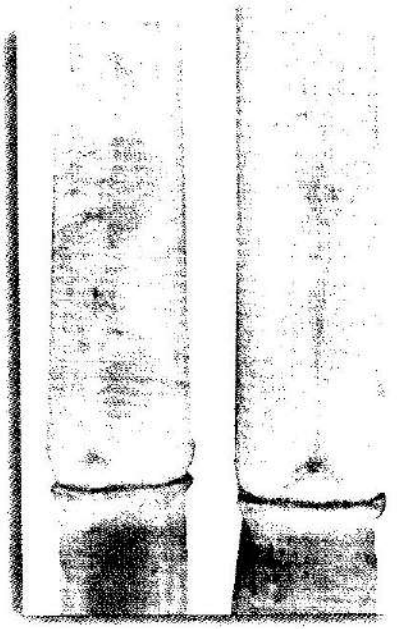

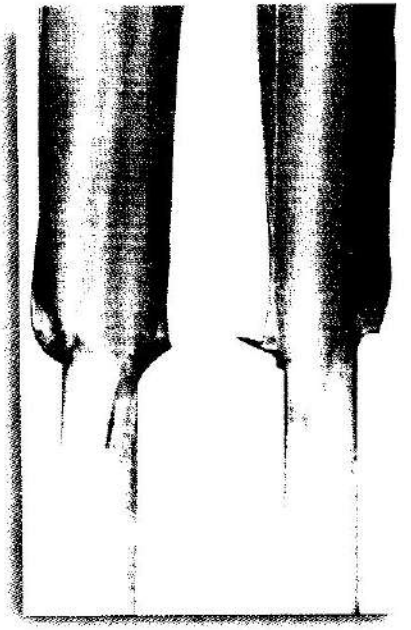

এটি সপুষ্পক জাত। এর পর্বমধ্য মোচাকৃতির, বাইরের ও ভিতরের অরিকল ভেন্টয়েড, চোখ ডিম্বাকৃতির

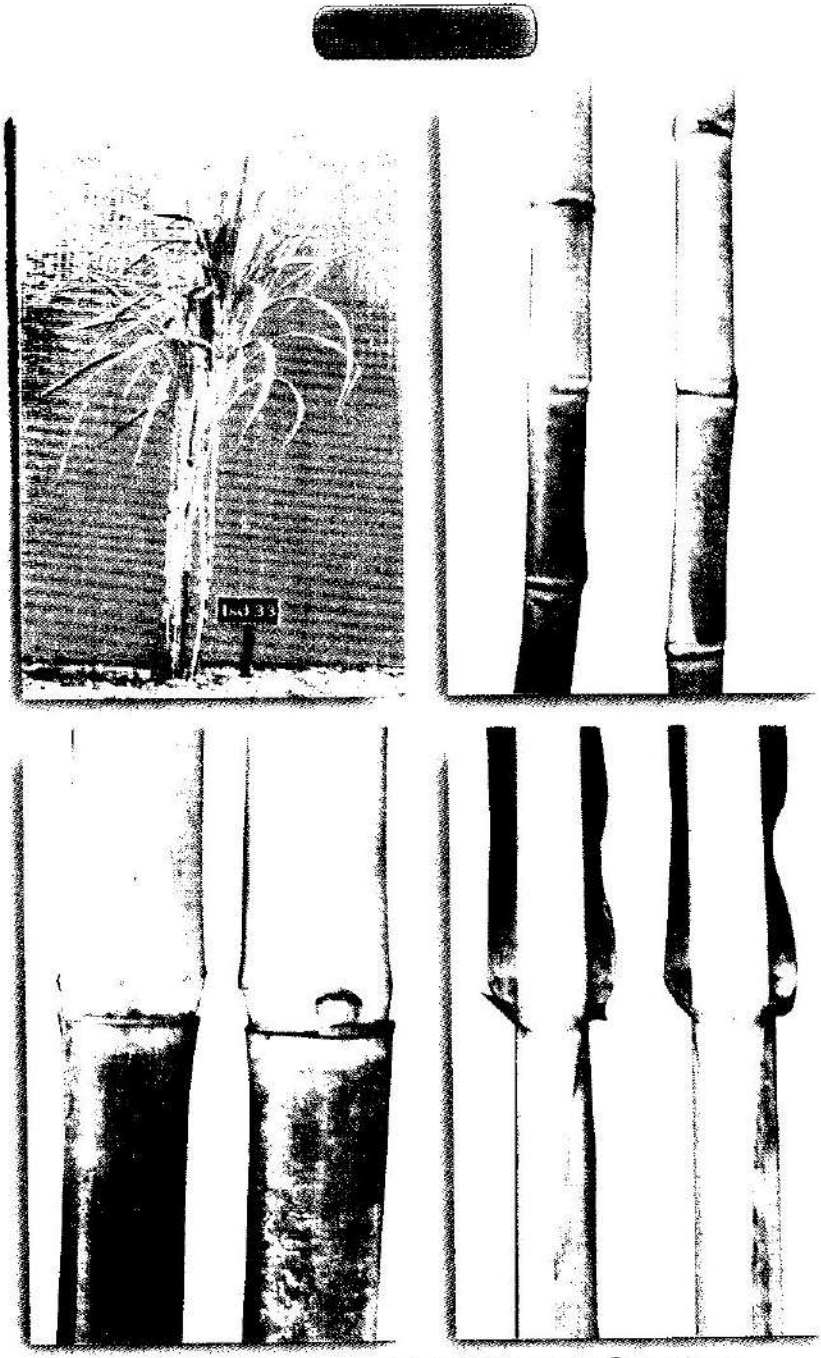

এটি সপুষ্পক জাত। এর পর্বমধ্য সিলিন্ডার আকৃতির, বাইরের ও ভিতরের অরিকল ট্রান্সজিশনাল-৩, চোখ গোলাকার।

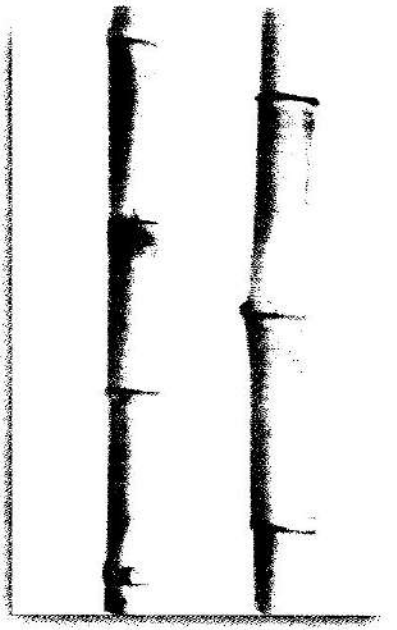

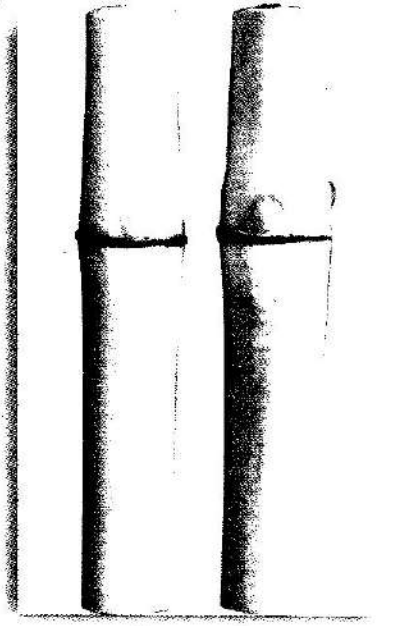

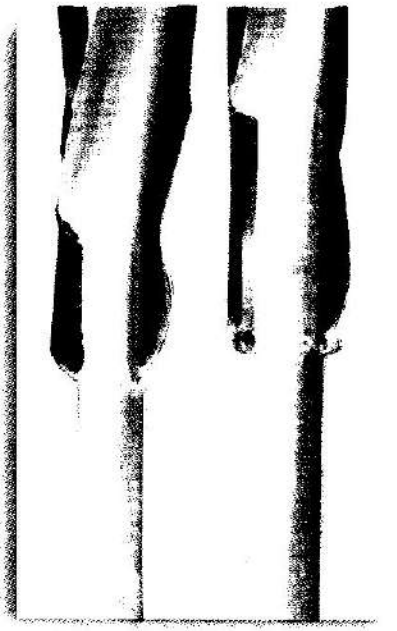

এটি অপুষ্পক জাত। এর পর্বমধ্য ববিন আকৃতির, বাইরের ও ভিতরের অরিকল ডেল্টয়েড, চোখ ত্রিকোণাকৃতির।

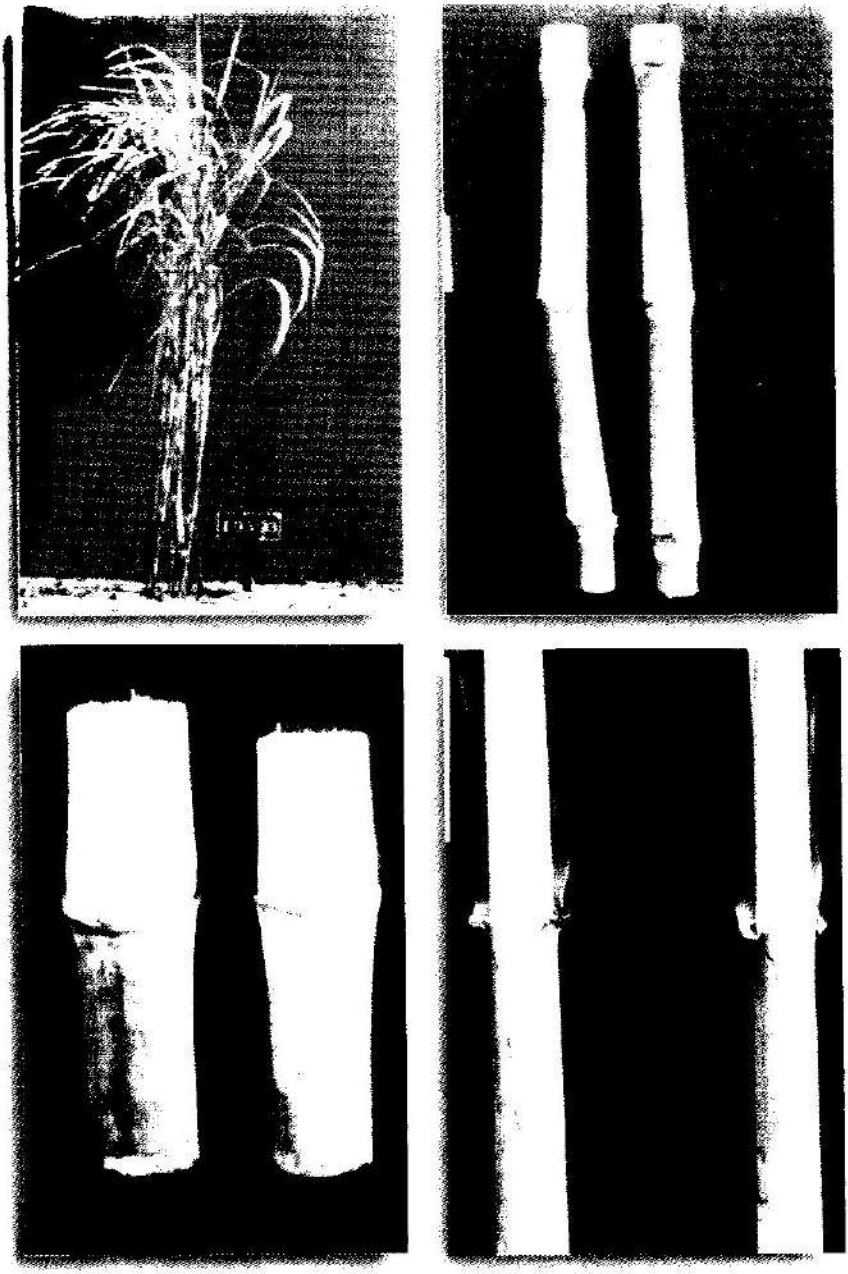

এটি সপুষ্পক জাত। এর পর্বমধ্য সিলিন্ডার আকৃতির, বাইরের অরিকল ট্রান্সভিশনাল-৩, ভিতরের অরিকল ভেল্টায়েড, চোখ গোলাকার

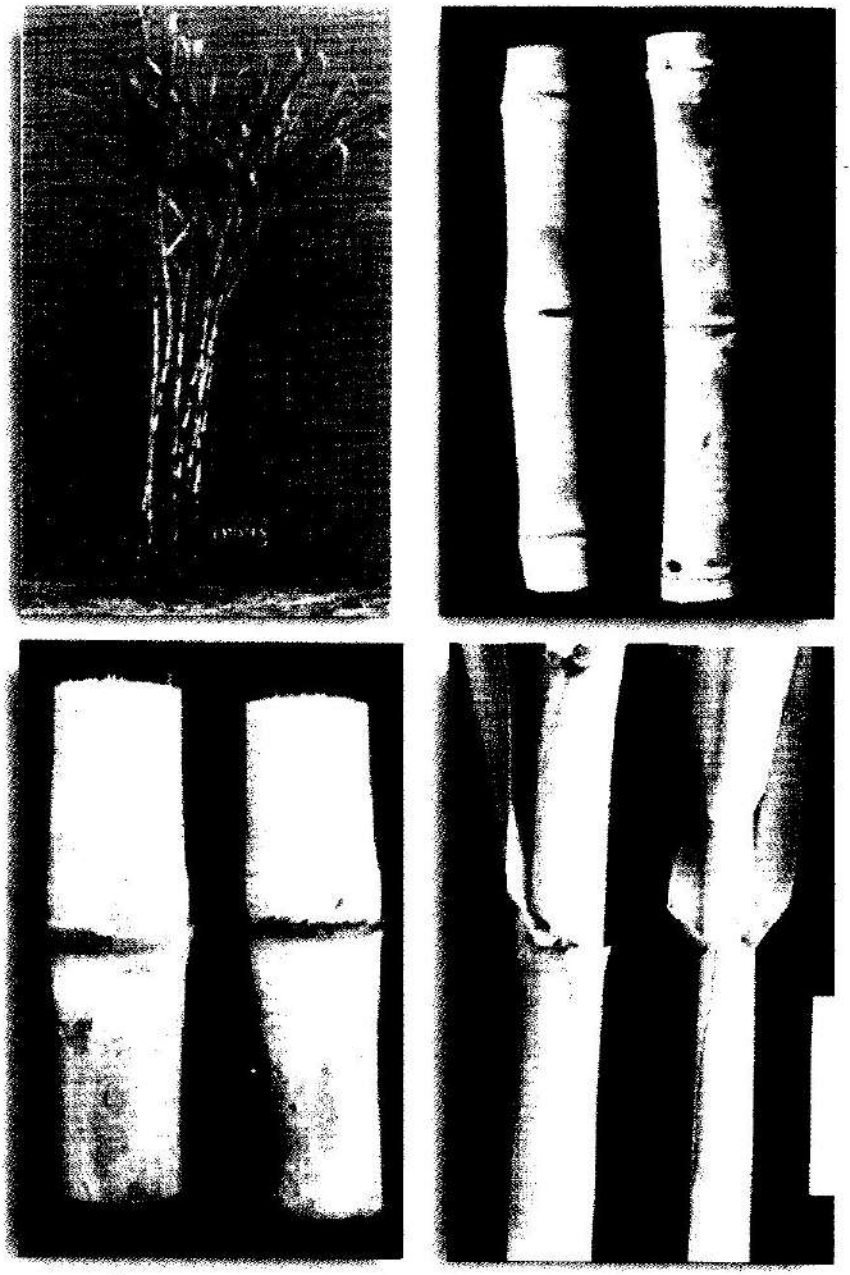

এটি অপুষ্পক জাত। এর পর্বমধ্য ববিন আকৃতির, বাইরের অরিকল ছোট, বর্শাকৃতির, ভিতরের অরিকল ডেল্টয়েড, চোখ ডিম্বাকৃতির।

ভাল বীজ প্লট থেকে ইক্ষুবীজ সংগ্রহ করুন

বীজখন্ড তৈরী ও শতকরা এক ভাগ ব্যাভিষ্টিন দ্রবণে বীজ শোধন করুন

বিভিন্ন পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত রোপা আখের চারা

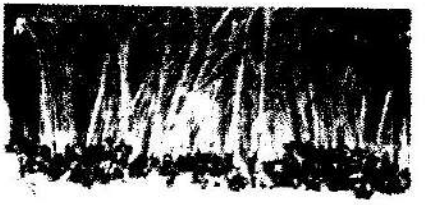

স্টকলেস পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত রোপা আখের চারা

মূল জমিতে ইক্ষুচারা রোপণ ও সেচ প্রদান

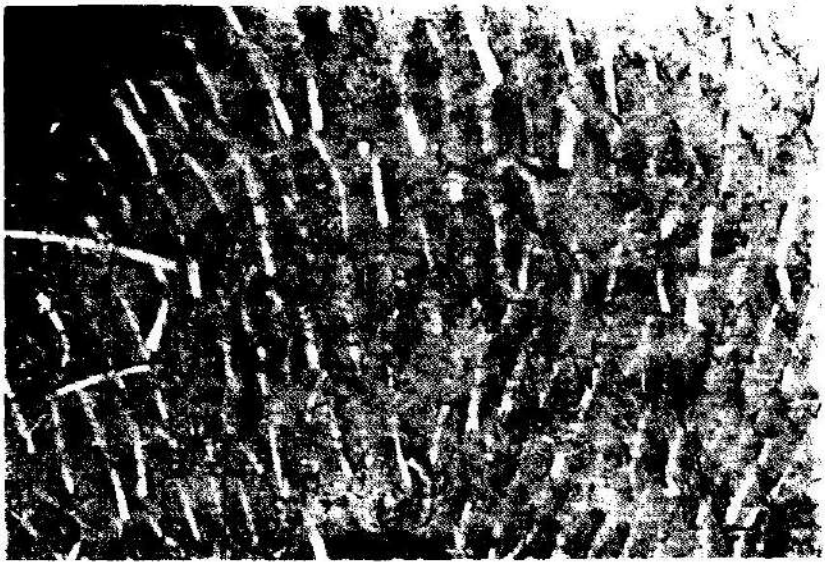

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় চিবিয়ে খাওয়া আখ চাষের জন্য তৈরীকৃত বীজতলা

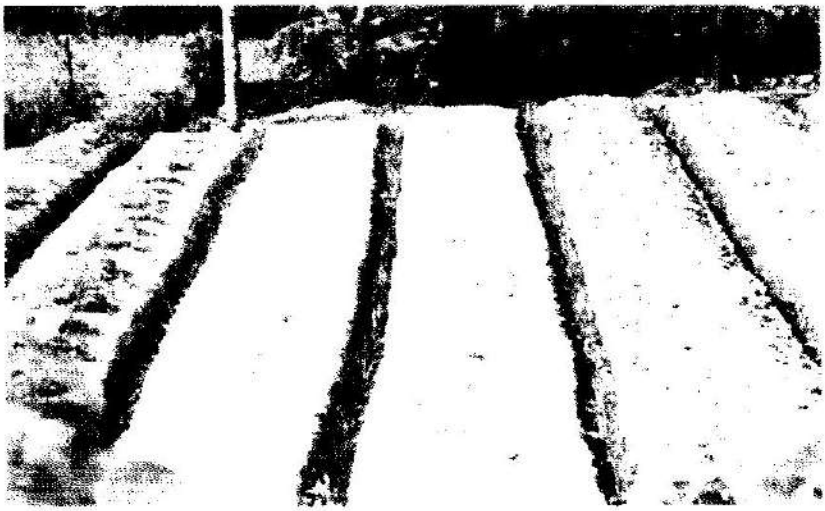

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় চিবিয়ে খাওয়া আখ চাষের জন্য চিরন্তনী ইক্ষু চাষ পদ্ধতিতে জমি তৈরী এ পদ্ধতিতে প্রথমে চওড়া সারিতে ইক্ষু চারা রোপণ করে এর মাঝে কয়েকটি সাথীফসল আবাদ করা হয়। এরপর ২/৩ বছর মুড়ি আখ ও সাথীফসল চাষ করা হয়। অতঃপর সাথীফসলের স্থানে ইক্ষু এবং ইক্ষুর স্থানে সাথীফসল স্থানান্তরিত হয়।

চিবিয়ে খাওয়া ইক্ষুর জমিতে উপযুক্ত যত্ন নিলে প্রচুর লাভ পাওয়া যায়

ঢাকার টঙ্গিতে চিবিয়ে খাওয়া ইক্ষুর পাইকারী বাজার

ইক্ষুর সাথে বিভিন্ন প্রকার সাথীফসলের চাষ

ইক্ষুর সাথে সাথীফসল আলু

ইক্ষুর সাথে সাথীফসল পিঁয়াজ

ইক্ষুর সাথে সাথীফসল রসুন

ইক্ষুর সাথে সাথীফসল বাঁধাকপি

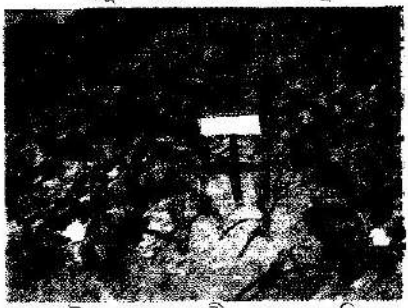

ইক্ষুর সাথে সাথীফসল ওলকপি

ইক্ষুর সাথে সাথীফসল ফুলকপি

ইক্ষুর সাথে সাথীফসল ব্রোকলি

ইক্ষুর সাথে সাথীফসল লেটুস

ইক্ষুর সাথে সাথীফসল গম

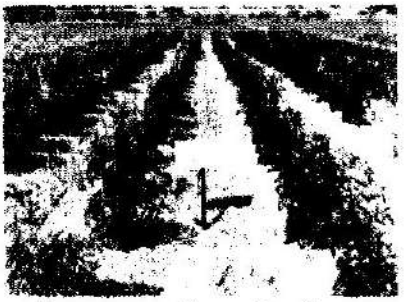

ইক্ষুর সাথে সাথীফসল টমেটো

ইক্ষুর সাথে সাথীফসল সরিষা

ইক্ষুর সাথে সাথীফসল সূর্যমুখী

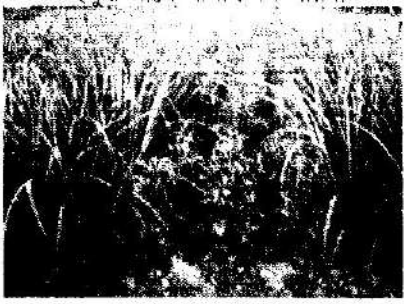

ইক্ষুর সাথে ২য় সাথীফসল তিল

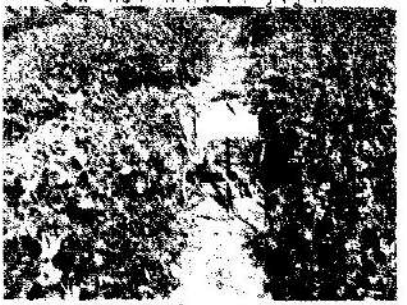

ইক্ষুর সাথে সাথীফসল মটরশুটি

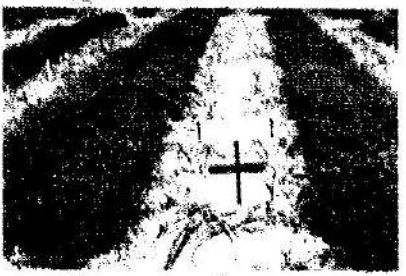

ইক্ষুর সাথে সাথীফসল ছোলা

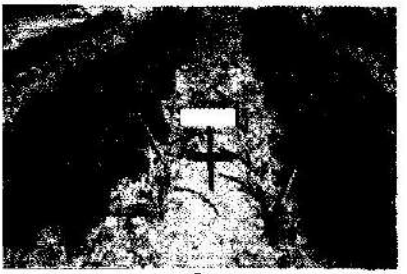

ইক্ষুর সাথে সাথীফসল মসুর

ইক্ষুর সাথে ২য় সাথীফসল গ্রীষ্মকালীন মুগ

ইক্ষুর সাথে সাথীফসল বুশবিন

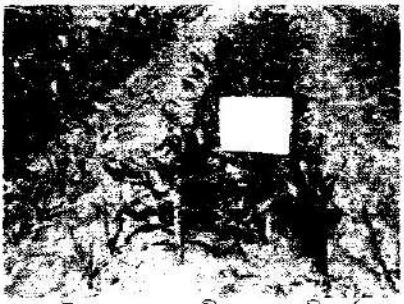

ইক্ষুর সাথে সাথীফসল বেবীকর্ণ

ইক্ষুর সাথে সাথীফসল গাজর

ইক্ষুর সাথে সাথীফসল পালংশাক

ইক্ষুর সাথে সাথীফসল কালজিরা

ইক্ষুর সাথে সাথীফসল মেথি

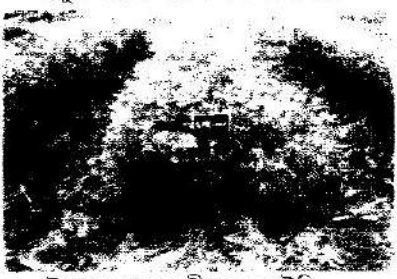

ইক্ষুর সাথে সাথীফসল মৌরি

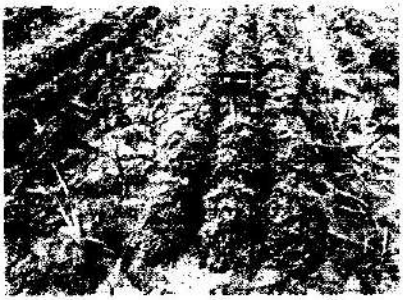

ইক্ষুর সাথে সাথীফসল রাঁধুনী

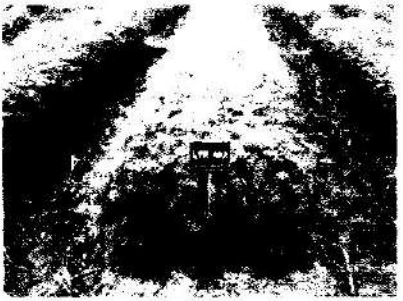

ইক্ষুর সাথে সাথীফসল সলুক

ইক্ষুর সাথে সাথীফসল ধনিয়া

ইক্ষুর সাথে সাথীফসল ফিরিঙ্গি

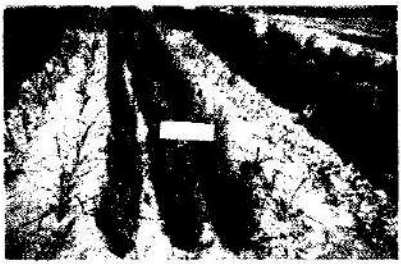

ইক্ষুর সাথে সাথীফসল তিসি

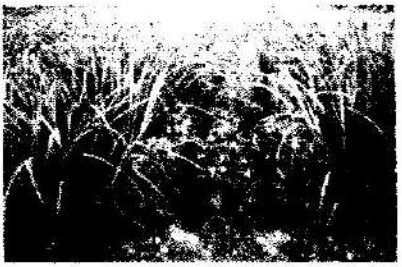

ইক্ষুর সাথে সাথীফসল তিল

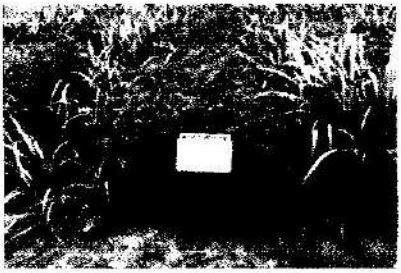

ইক্ষুর সাথে সাথীফসল ধৈঞ্চা

ইক্ষুর সাথে ৩য় সাথীফসল লতিকচু

ইক্ষুর রোগ বালাই ও তার দমন ব্যবস্থাপনা

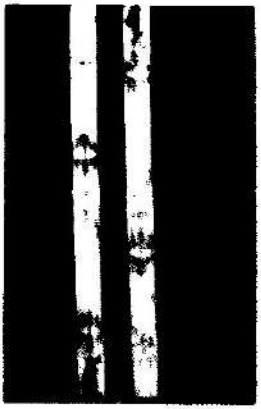

লাল পচা রোগাক্রান্ত আখের কান্ড

লাল পচা রোগাক্রান্ত আখক্ষেত

সাদা পাতা রোগাক্রান্ত আখের ঝাড়

সাদ পাতা রোগাক্রান্ত বয়স্ক আখ

স্মাট রোগাক্রান্ত আখের ঝাড়

উইল্ট আক্রান্ত ইক্ষু কান্ডের ছবি

আখের বীজ পচা (পাইনএ্যাপল ডিজিজ) রোগাক্রান্ত বীজখন্ড

টপ রট আক্রান্ত আখের ডগা

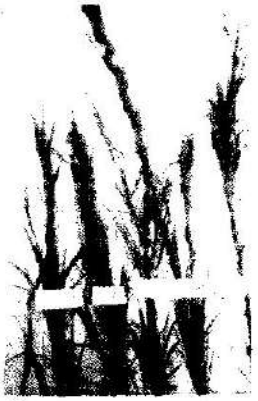

লিফস্কল্ড রোগাক্রান্ত আখ

লিফস্কল্ড রোগাক্রান্ত আখের পাতা

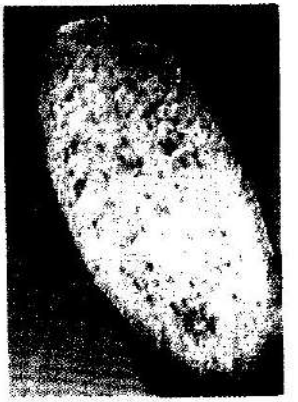

লিফস্কল্ড রোগাক্রান্ত আখের অভ্যন্তর ভাগ

রেড স্ট্রাইপ রোগাক্রান্ত আখের পাতা

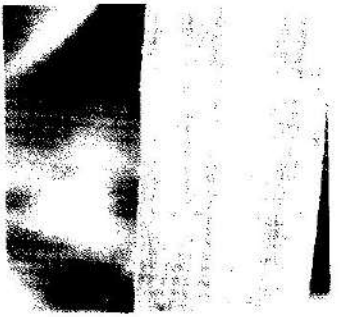

মোজাইক রোগাক্রান্ত আখের পাতা

মুড়ি খর্বা (আরএসভি) রোগাক্রান্ত আখের গীরার অভ্যন্তর ভাগ

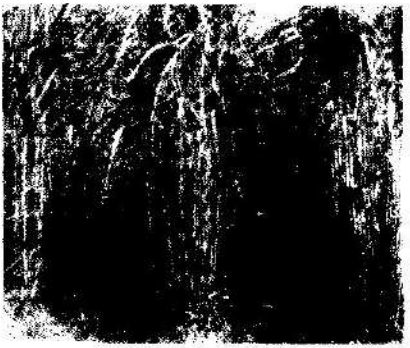

মুড়ি খর্বা (আরএসডি) রোগাক্রান্ত আখ

বিজলী ঘাস আক্রান্ত আখক্ষেত

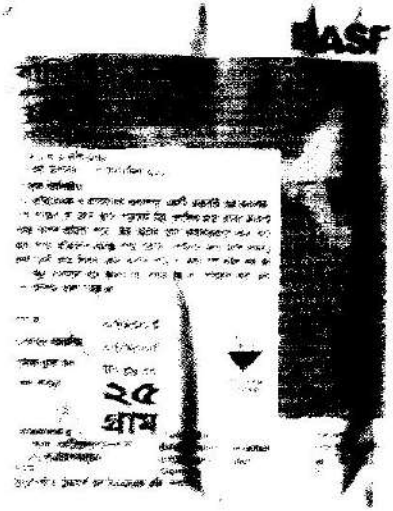

সতর্কতা ১ ভাগ ব্লিচিং দিয়ে ইক্ষুবীজ শোধন করতে হবে

ইক্ষুর পোকা মাকড় ও তার দমন ব্যবস্থাপনা

ডগার মাজরা পোকা আক্রান্ত আখ গাছ

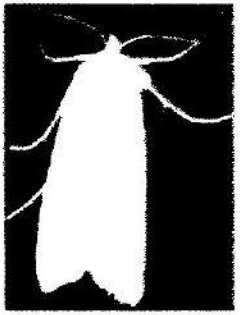

ডগার মাজরা পোকার মথ ও কীড়া

ডগার মাজরা পোকার ডিম

বাঁশের তৈরী প্যারাসাইট বুষ্টারে ডিম ফেলা

ডগার মাজরা পোকা দমনে কীটনাশক কার্বোফুরান (ফুরাডান) প্রয়োগ

কার্বোফুরান প্রয়োগকৃত (ডানে) এবং অপ্রয়োগকৃত (বামে) প্লট

আগাম মাজরা পোকার ডিমের গাদা

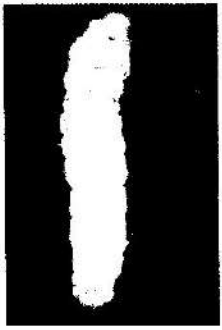

আগাম মাজরা পোকার কীড়া

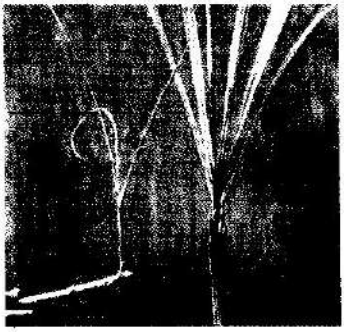

আগাম মাজরা পোকা আক্রান্ত গাছ

আগাম মাজরা পোকা দমনে কীটনাশক কার্বোফুরান
প্রয়োগকৃত (ডানে) ও অপ্রয়োগকৃত (বামে) প্লট

গোড়ার মাজরা পোকা
আক্রান্ত গাছ

গোড়ার মাজরা পোকার মথ

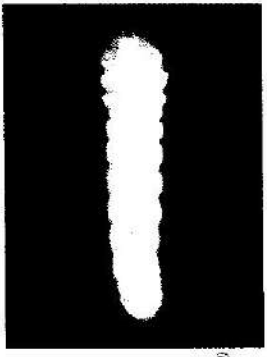

গোড়ার মাজরা পোকার কীড়া

গোড়ার মাজরা পোকা
আক্রান্ত গাছের গোড়া

গোড়ার মাজরা পোকা আক্রান্ত গাছ
কোদাল দিয়ে তুলে ফেলা হচ্ছে

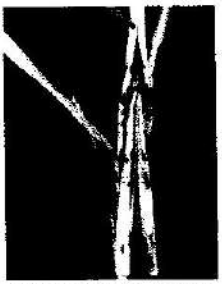

কান্ডের মাজরা পোকা
আক্রান্ত গাছ

কান্ডের মাজরা
পোকার মথ

কান্ডের মাজরা
পোকার ডিম

কান্ডের মাজরা
পোকার কীড়া

কান্ডের মাজরা পোকা
আক্রান্ত গাছের
যান্ত্রিক দমন

কান্ডের মাজরা পোকার ডিমের
পরজীবি ট্রাইকোগ্রামা
মাঠে ছাড়া হচ্ছে

কান্ডের মাজরা পোকার
ডিমের গাদায়
ট্রাইকোগ্রামার আক্রমন

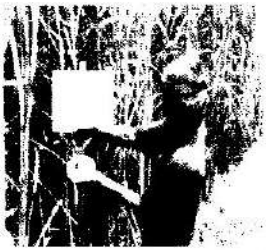

কান্ডের মাজরা পোকা দমনের জন্য কীটনাশক পাডান ৪জি প্রয়োগ
করে কোদাল দিয়ে মিশিয়ে দেয়া হচ্ছে

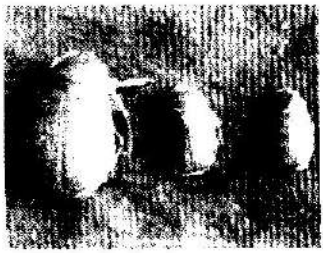

হোয়াইট গ্রাবের বিটল

হোয়াইট গ্রাবের কীড়া

হোয়াইট গ্রাব আক্রান্ত আখ ক্ষেত

হোয়াইট গ্রাব আক্রান্ত আখক্ষেতে কীটনাশক (কার্বোফুরান) প্রয়োগ

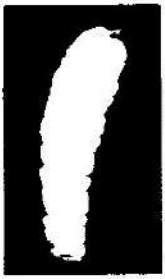

উই পোকার রাণী

উই পোকা আক্রান্ত আখ সেটের অংশ

কীটনাশক লরসবান প্রয়োগকৃত প্লট

কীটনাশক ডারসবান প্রয়োগকৃত প্লট

পাইরিলা পূর্ণাঙ্গ

পাইরিলা ডিমের গাদার যান্ত্রিক দমন

হাত জাল (বামে) ও টানা জালের (ডানে) সাহায্যে পাইরিলা সংগ্রহ পদ্ধতির প্রদর্শনী

ইক্ষুর ক্ষতিকর পোকা মাকড় দমনে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের কীটনাশক

ইক্ষুর পুষ্টি চাহিদা ও ইক্ষুর জমিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার সার

ইক্ষুক্ষেতে নাইট্রোজেনের অভাবে পুরাতন পাতা অগ্রভাগ থেকে মরতে শুরু করে। পাতা সমানভাবে হালকা সবুজ থেকে ক্রমশঃ হলুদ বর্ণ ধারণ করে। কান্ড-পর্ব ছোট এবং চিকন হতে থাকে; বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

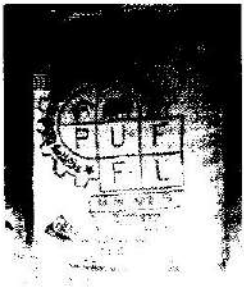

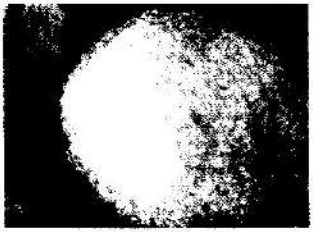

ইক্ষুক্ষেতে নাইট্রোজেনের অভাব দূর করতে হেক্টরপ্রতি ২৬০ কেজি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে।

ইক্ষুক্ষেতে ফসফরাসের অভাবে পাতা গাঢ় সবুজ থেকে নীলাভ সবুজ রং ধারণ করে। বয়স্ক পাতার অগ্রভাগ থেকে মরা শুরু হয়।

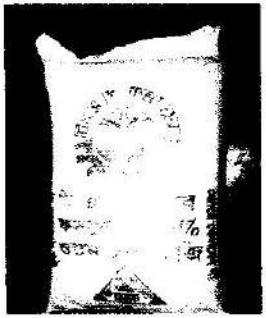
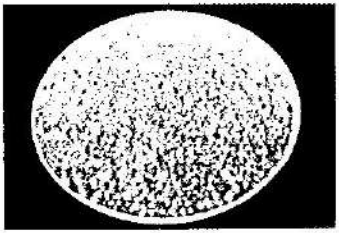

ইক্ষুক্ষেতে ফসফরাসের অভাব দূর করতে হেক্টরপ্রতি ১৮০ কেজি টিএসপি সার প্রয়োগ করতে হবে।

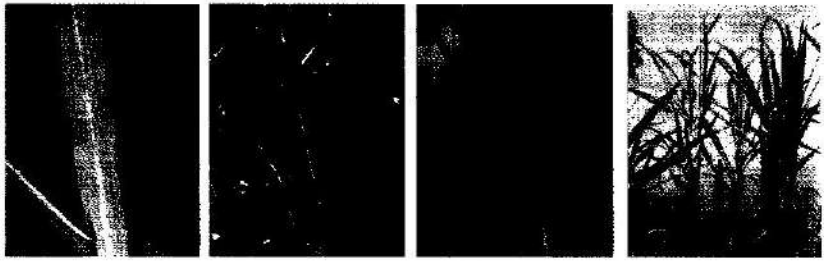

ইক্ষুক্ষেতে পটাসিয়ামের অভাবে পাতার অগ্রভাগ ও কিনারায় হলুদ-কমলা রঙের ক্লোরোসিস দেখা দেয়। উপশিরার মধ্যবর্তী জায়গায় ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে। বয়স্ক পাতা পুরোপুরি বাদামী বর্ণ ধারণ করে যা পুড়া চিহ্নের মত মনে হয়। পাখার মত গুচ্ছ আগা তৈরী হতে পারে।

ইক্ষুক্ষেতে পটাসিয়ামের অভাব দূর করতে হেক্টরপ্রতি ১৫০ কেজি এম পি সার প্রয়োগ করতে হবে।

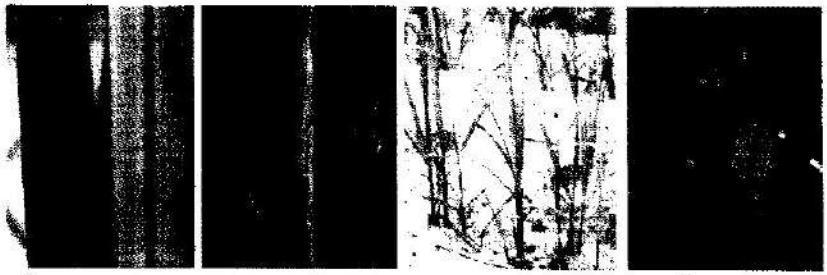

ইক্ষুক্ষেতে সালফারের অভাবে কচি পাতা হলুদাভ রং ধারণ করে। পুরো গাছই হালকা সবুজ হয় এবং কুকড়ে যায়। পাতা চিকন হয় এবং পুরো গাছটিই ক্রমশঃ সরু হয়ে শুকিয়ে যায়।

ইক্ষুক্ষেতে সালফারের অভাব দূর করতে হেক্টরপ্রতি ১৪০ কেজি জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হবে।

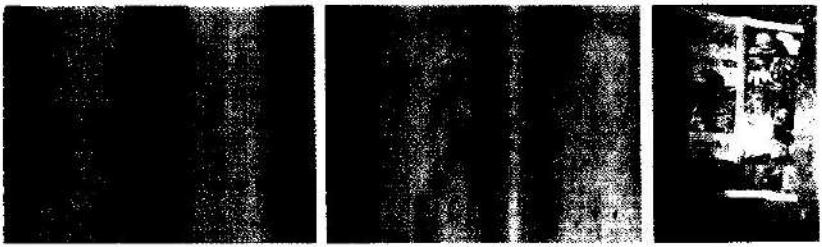

ইক্ষুক্ষেতে দস্তার অভাবে পত্রফলকের মাঝামাঝি হলুদ ব্যান্ড তৈরী হয়। তবে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত না হলে মধ্যশিরা ও পাতার প্রান্ত সবুজ থাকে। প্রায়শঃই লাল দাগ দেখা যায় যার উপরে ছত্রাক রোগের সংক্রমন হয়। ইক্ষুক্ষেতে দস্তার অভাব দূর করতে হেক্টরপ্রতি ৬ কেজি জিঙ্ক সালফেট সার প্রয়োগ করতে হবে।

ইক্ষু খামার যন্ত্রায়ন

ট্রাক্টর

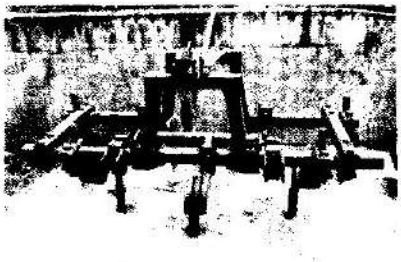

স্প্রিং থ্রেড হ্যারো

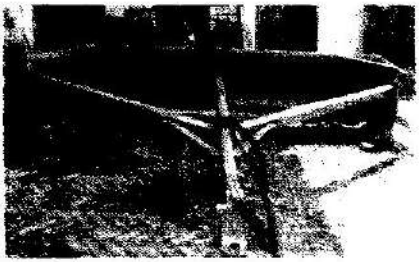

লেভেলার

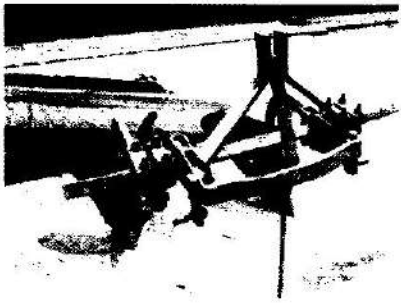

ট্রেঞ্চার

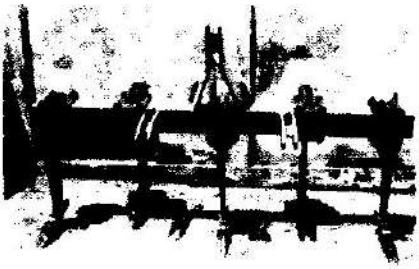

হেভী রিপার

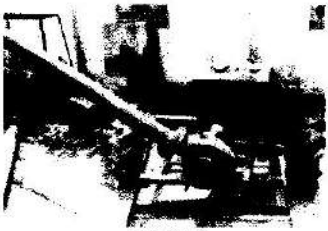

সেচ যন্ত্র

গরম পানিতে বীজ শোধন যন্ত্র

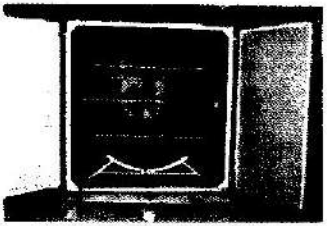

আদ্র-গরম বাতাসে বীজ শোধন যন্ত্র

বিএসআরআই উদ্ভাবিত কয়েকটি খামার যন্ত্র

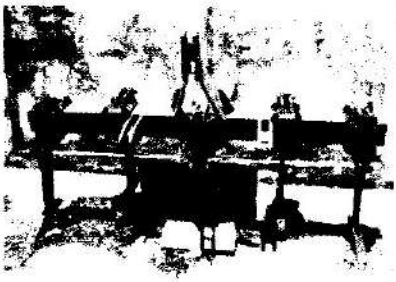

জোড়াসারি ট্রেঞ্চার

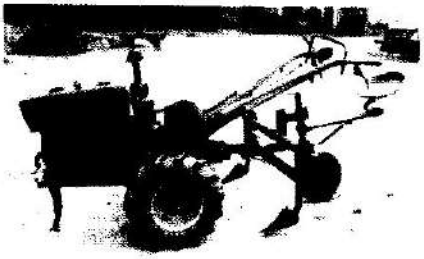

পাওয়ার টিলার চালিত ট্রেঞ্চার

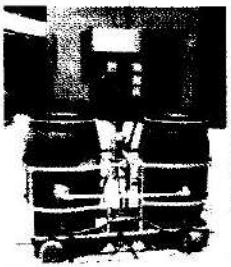

মিনি হট-ওয়াটার ট্যাঙ্ক

বাড চীপ কাটার

সেট কাটার

প্যাডেল পাম্প

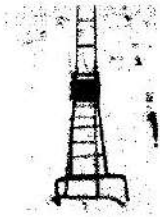

উইডার

ড্রিট্রাশার

হ্যান্ড-হো

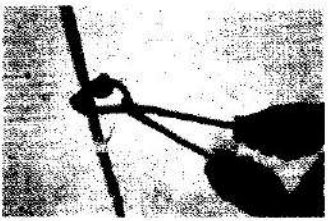

হ্যান্ড বাড চীপ কাটার

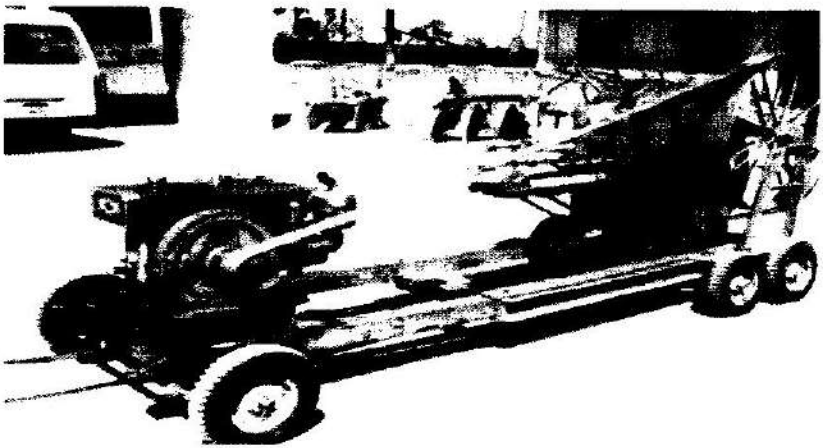

উন্নত ইক্ষু মাড়াইকল

উন্নত ইক্ষুজাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ

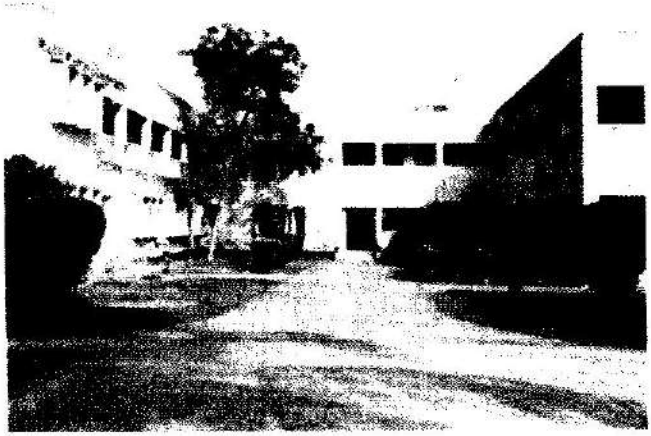

বিএসআরআই এর প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ভবন

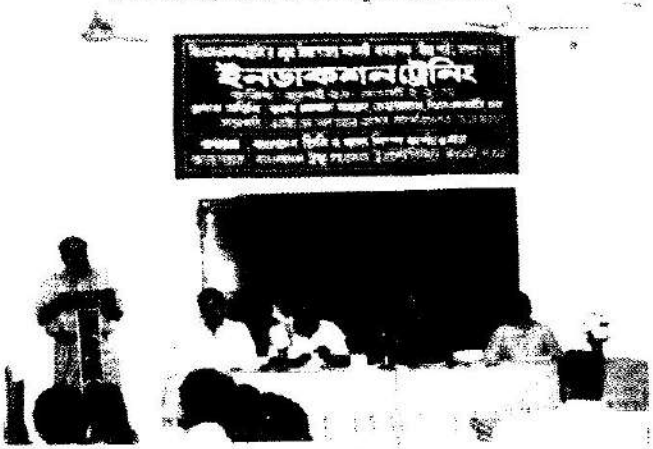

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ

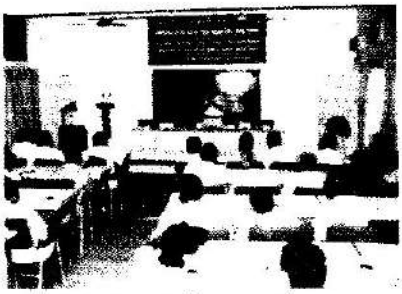

ইক্ষু উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা

ইক্ষু বিষয়ক সেমিনার

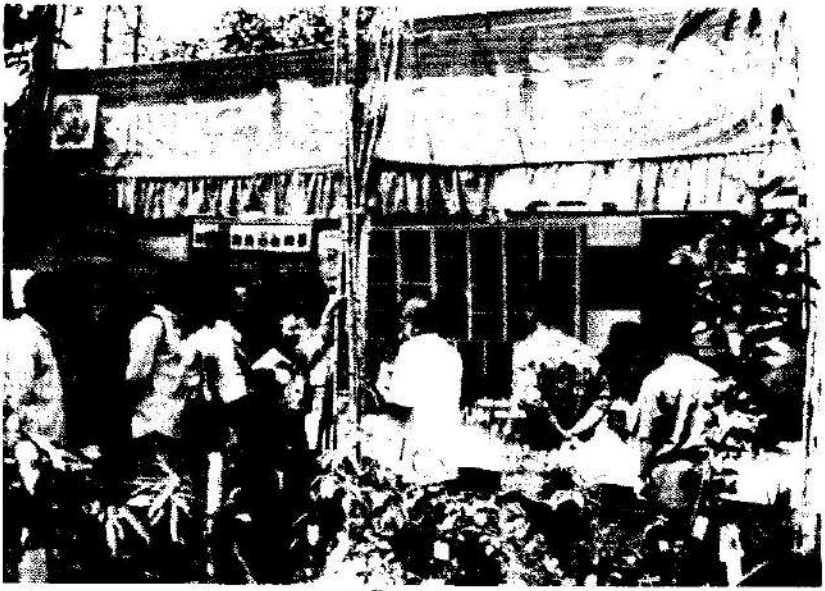

কৃষি মেলা

প্রশিক্ষণের ব্যবহারিক ক্লাস

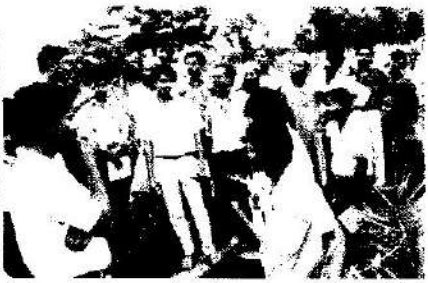

রোপা আখ চাষের ব্যবহারিক ক্লাস

ইক্ষুভিত্তিক খামার স্কুল

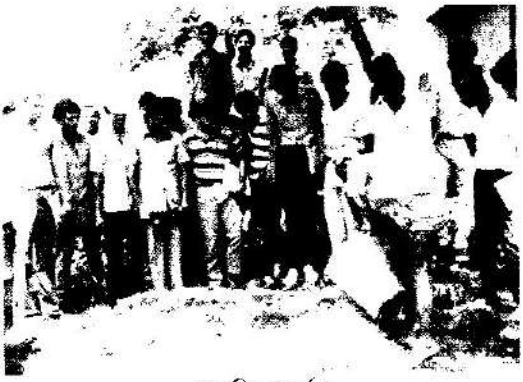

প্রদ্ধতি প্রদর্শন

চাষীর জমিতে স্থাপিত প্রদর্শনী প্লট

গুড় উৎপাদন

মাড়াইকলে ইক্ষু মাড়াই

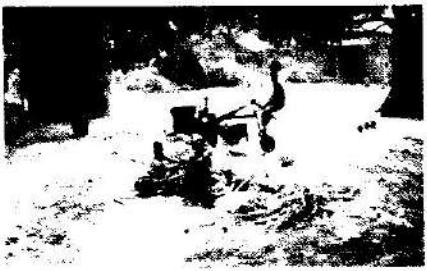

যন্ত্রচালিত মাড়াইকলে ইক্ষু মাড়াই

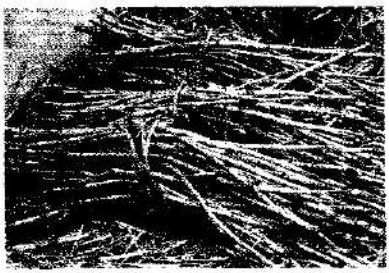

মাড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতকৃত আখ

রস জ্বালানো রসের মান ও তাপমাত্রা পরীক্ষা

গুড় বয়েলিং হাউজ

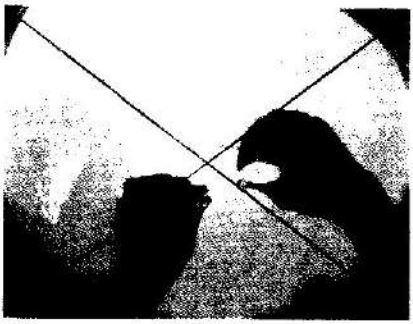

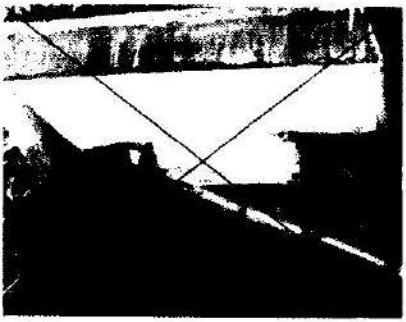

গুড় পরিস্কার করতে ক্ষতিকর দ্রব্য হাইড্রোজ ব্যবহার নিষিদ্ধ

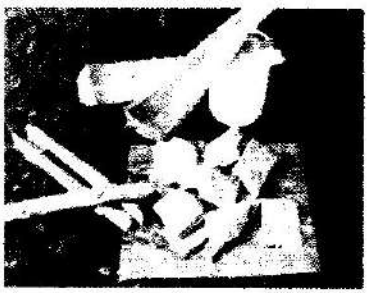

উদ্ভিজ গুড় পরিষ্কারক ঘৃত কুমারী

কড়াই থেকে গুড় স্থানান্তর

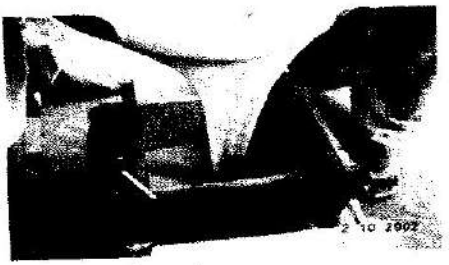

কাঠের ফর্মায় গুড় স্থানান্তর

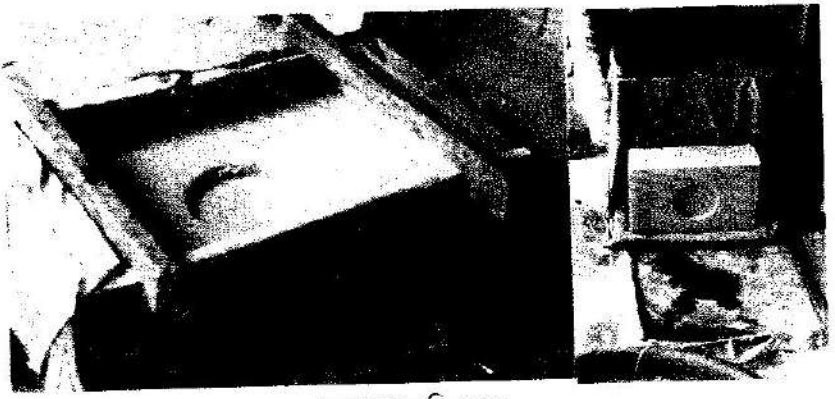

চতুষ্কোণাকৃতির গুড়

নাটোরে গুড় পরিবহন

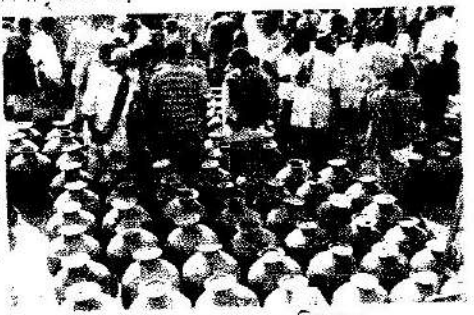

বেড়া, পাবনায় গুড় বিপণন

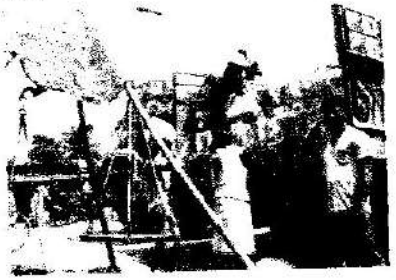

গুড় স্থানান্তর

গুড় পরিবহন

জামালপুরে গুড় বিপণন

খেজুর, তাল ও গোলপাতা গাছ থেকে রস আহরণ ও গুড় তৈরী

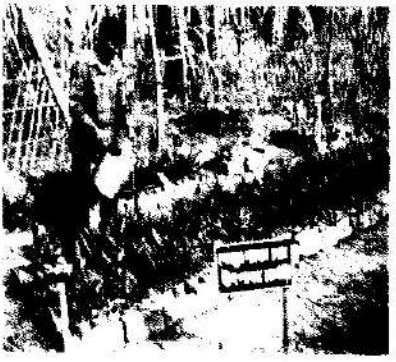

খেজুর গাছের নার্সারী বেড

খেজুর বাগানের পরিচর্যা

খেজুর গাছের রস আহরণ

খেজুরের রস বিপণন

খেজুরের গুড়

খেজুর রসের প্রসেসকৃত সিরাপ

স্টেভিয়া ঃ একটি সম্ভাবনাময় মিষ্টি জাতীয় গাছ

গোলপাতা গাছের রস আহরণ

তালগাছের পরিচর্যা

তালগাছের রস আহরণ